অক্টোবর ২০২০-মার্চ ২০২১

নাগরিক উদ্যোগ

সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

করোনা বিপর্যয়: সমন্বয়হীনতা ও জনদুর্ভোগের একবছর

২০২০ সালে বাংলাদেশে শ্রম পরিস্থিতি: একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

করোনা মহামারিকালে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন: ঢাকার আকাশে মিথেন গ্যাসের অধিক উপস্থিতি: চরম তাপদাহ

সূচিপত্র

নাগরিক উদ্যোগ

সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

বর্ষ: ১০। সংখ্যা: ১ম। অক্টোবর ২০২০-মার্চ ২০২১

সম্পাদক
জাকির হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ
জাকির হোসেন
মনজুরুল ইসলাম
মারুফিয়া নূর
ফারিবা তাবাসসুম
জয়ন্ত কুমার শাওন

করোনা বিপর্যয়: সমন্বয়হীনতা ও জনদুর্ভোগের একবছর /৩

করোনা অতিমারীতে পর্যুদস্ত দেশ। এর মধ্যেই পার হয়ে গেছে একটি বছর। এই অতিমারী মোকাবেলায় বিশ্বের কোন দেশেরই অভিজ্ঞতা ছিলনা। তারপরও নিজ নিজ জায়গা থেকে করোনাকে মোকাবেলার জন্য নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে করোনা মোকাবেলায় দেখা গেছে সমন্বয়হীনতা, দূর্বলতা ও দুর্নীতি। বিশেষ করে স্বাস্থ্য খাতে জনদুর্ভোগ ছিল চোখে পড়ার মত।

কোভিড-১৯ এর বিস্তারে তথ্যের অবাধ প্রবাহের কণ্ঠরোধ এর প্রভাব /১৫

করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত প্রথম খবরটি উহানে গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৯ প্রকাশিত হওয়ার বেশ কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত উহান পৌর স্বাস্থ্য কমিশন কোনো সরকারি নোটিশ জারি করেনি এবং তারপর থেকে উহান শহরের কর্মকর্তারা এই রোগের ভয়াবহতাকে তুচ্ছ করে ইচ্ছাকৃতভাবে এ-সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশকে দমন করার চেষ্টা করেছেন। সরকার নাটকীয়ভাবে ইন্টারনেট, মিডিয়া এবং নাগরিক সমাজের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে এবং এই রোগ সম্পর্কে 'গুজব' ছড়ানোর জন্য পুলিশ জনগণকে হয়রানি করে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ, বাক-স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা না থাকাই করোনার মতো মহামারি ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে প্রধানতম কারণসমূহ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

২০২০ সালে বাংলাদেশে শ্রম পরিস্থিতি: একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন /২০

দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের অবদান অন্যতম। কৃষক, গার্মেন্টস, পাটকল, চা শ্রমিকসহ বিভিন্ন সেক্টরে নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এর শ্রম-ঘামে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল আছে। কিন্তু এই মানুষগুলো পায় না তাদের ন্যায্য মজুরি ও প্রাপ্য অধিকার। ২০২০ সালে দেশের বিভিন্ন সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন, সংগ্রাম, দাবি ও শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে দেশের বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে লেখাটি তৈরি করা হয়েছে।

আরো যা আছে

করোনা-মহামারি কালে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট	১৭
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তথ্যানুসন্ধান: গুজব রটিয়ে ধর্মীয় উন্মাদনা: লালমনিরহাটে শত মানুষের উপস্থিতিতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড	৩১
লাকিংমে অপহরণ ও হত্যা: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতনে নির্বিকার থাকার আরেকটি নির্মম পরিণতি	৩৩
সুনামগঞ্জের শাল্লায় হিন্দু পল্লীতে সংঘবদ্ধ সাম্প্রদায়িক হামলা	৩৪
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন: ঢাকার আকাশে মিথেন গ্যাসের অধিক উপস্থিতি: চরম তাপদাহ	৩৬
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে কৃষিজমি ও জলাধার রক্ষা	৪০
আইনের ফাঁকফোকর না প্রয়োগগত সমস্যা: একটি বিশ্লেষণ	৪৪
নারীদের নিকাহ রেজিস্ট্রার হতে বাধা কোথায়?	৪৭

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
বারেক হোসেন মিঠু

আলোকচিত্র
নাগরিক উদ্যোগ ও ইন্টারনেট

প্রকাশক
সম্পাদক কর্তৃক ৮/১৪, ব্লক-বি, লালমাটিয়া
ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।

মুদ্রণ
প্রকাশক কর্তৃক নূর কার্ড বোর্ড বক্স ফ্যাক্টরী, ১৯/১, নীলক্ষেত বাবুপুরা, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : ৪০ টাকা

যোগাযোগ
ফোন : ৪৮১২২৮২৯, ফ্যাক্স : ৪৮১২১৪৫৫
মোবাইল : ০১৭১৩ ০৮১৮৫২
ই-মেইল : nuddyog@gmail.com

সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯ এর কারণে সমগ্র বিশ্ব বিপর্যস্ত। ২০২০ সালের মার্চের শুরুতে ছড়িয়ে পড়া এই ভাইরাসে বাংলাদেশে এক বছরের মধ্যে ৬ লক্ষের ওপর মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন আর প্রাণহানি হয়েছে প্রায় ৯ হাজার মানুষের। করোনা আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা করোনার মারাত্মক বিপর্যয় এড়াতে পেরেছি। তবে করোনা মোকাবেলায় আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার হতাশাজনক চিত্রটিও প্রকট হয়েছে যা প্রমাণ করে করোনার ভয়াবহ বিস্তার হলে তা মোকাবেলা করা খুবই কঠিন হতো । চীনে কোভিড-১৯ সংক্রমণের পর পর্যাপ্ত সময় পেলেও আমরা তা মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিতে পারিনি। উপরন্ত এ সংখ্যাটি প্রস্তুতের সময় আমরা করোনার ২য় পর্যায়ে ঢুকে পড়েছি, আক্রান্ত ও মৃত্যুর যে হার প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে তা ১ম পর্যায়ের তুলনায় দ্বিগুনের চেয়ে বেশি।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সরকার বছরব্যাপী নানা ধরণের পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে দেশের মানুষ আশ্বস্ত হতে পারেনি। শুধু স্বাস্থ্যখাতে অব্যবস্থাপনা নয়, করোনা মোকাবেলা করতে গিয়ে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত নাগরিকের জীবন ও জীবিকার বিপন্নতা নিয়েও সরকারের সুনির্দিষ্ট কোন ভাবনা পরিলক্ষিত হয়নি। ব্র্যাকের এক সমীক্ষায় দেখে গেছে করোনায় চরম দারিদ্র্যের হার ৬০ শতাংশ বেড়েছে। সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণের জন্য সরকার অনেকগুলো সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচী নিলেও দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে তাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। একদিকে সরকার করোনা প্রতিরোধে সর্বাত্মক লকডাউনের ঘোষণা দিলেও মালিকপক্ষের চাপে পোশাক কারখানাগুলোকে বিধিনিষেধের বাইরে রাখতে বাধ্য হয়েছিল। করোনা অতিমারির মধ্যেও ভিন্নমত দমনে সরকারকে আরো কঠোর হতে দেখা গেছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে মুক্ত চিন্তক, লেখক, গণমাধ্যমকর্মীদের গ্রেফতার ও হয়রানির বিষয়টি বছর জুড়েই আলোচিত ছিল।

করোনার কারণে স্বাভাবিক কার্যক্রম বারবার ব্যাহত হওয়ায় 'নাগরিক উদ্যোগ' নিয়মিত প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তাই অক্টোবর, ২০২০- মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত ২টি সংখ্যাকে এবার একসাথে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এবারের সংখ্যাটিতে গত এক বছরে করোনা সংক্রমন, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

করোনা বিপর্যয়: সমন্বয়হীনতা ও জনদুর্ভোগের একবছর

- নাগরিক উদ্যোগ ডেস্ক প্রতিবেদন

২০২১ এর মার্চ-এ দেশ করোনা সংক্রমণের এক বছর পার করল। ডিসেম্বর ২০১৯ এ চীনে সূত্রপাত হওয়া কোভিড-১৯ মোকাবেলায় পৃথিবীর কোন দেশেরই কোন অভিজ্ঞতা ছিলনা। তারপরও প্রতিটি দেশ নিজ নিজ জায়গা থেকে চেষ্টা করেছে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও প্রতিকারে। কিন্তু আমাদের দেশে এই এক বছরে করোনা মোকাবেলায় পরিকল্পিত কাজের চেয়ে অনেকটা অগোছালো অবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে নেতৃত্বের দূর্বলতা, সমন্বয়হীনতা, জনদুর্ভোগ ও দুর্নীতি বার বার উঠে এসেছে গণমাধ্যমে। চীনে কোভিড-১৯ সংক্রমণের পর পর্যাপ্ত সময় পেলেও আমরা তা মোকাবেলায় যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারেনি। উপরন্ত এ সংখ্যাটি প্রস্তুতের সময় আমরা করোনা সংক্রমণের ২য় পর্যায়ে ঢুকে পড়েছি। আক্রান্ত ও মৃত্যুর যে হার প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে তা ১ম পর্যায়ের তুলনায় দ্বিগুনের চেয়ে বেশি।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সরকার বছরব্যাপী নানা ধরণের পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও অব্যবস্থাপনার কারণে কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে দেশের মানুষ আশ্বস্থ হতে পারছে না। এই অতিমারির শেষ কবে তা নিয়ে মানুষের মধ্যে আছে গভীর অনিশ্চয়তা। শুরুর সমন্বয়হীনতা এখনো দূর হয়নি, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা বেড়েছে। যদিও ৮ মার্চ ২০২০-এ ১ম রোগী শনাক্ত হওয়ার পর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে সংক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করেনি। বাংলাদেশে কেন সংক্রমণ বা মৃত্যু তুলনামূলক কম, এর কোন বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা জনস্বাস্থ্যবিদদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। চলমান সমন্বয়হীনতা নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মহামারির শুরুতেই বলেছে যে, মহামারি মোকাবেলা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একার কাজ নয়, একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। গোটা সরকার ব্যবস্থাকে এর সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। কাজে থাকতে হবে সমন্বয়। যার ঘাটতি দেশে বারবার দেখা গেছে। এই লেখায় গত এক বছরে করোনা সংক্রমণ, নিয়ন্ত্রণ ও অব্যবস্থাপনার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

করোনার শুরুটা যেভাবে:

সময়টা ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। চীনের হুবেই প্রদেশের রাজধানী উহানের বেশ কিছু লোক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। আক্রান্ত ব্যক্তিদের বেশির ভাগ হুনান সিফুড হোলসেল মার্কেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যেখানে বন্য প্রাণী বিক্রি করা হতো। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছিল

> দেশে শুরুতে বিদেশ ফেরত ও তাদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ সীমিত থাকলেও দ্রুত তা ব্যাপকভাবে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ৮ মার্চ ২০২০ যে তিনজন রোগী প্রথম শনাক্ত হন তাদের দুজন ছিলেন ইতালি ফেরত। অন্য একজন ইতালি ফেরত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন। তবে শুধু ইতালি নয়, কমপক্ষে আটটি দেশ থেকে আসা প্রবাসীর মধ্যে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছিল।

প্রাণী থেকে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। চীনের বিজ্ঞানীরা তাৎক্ষণিকভাবে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন বলে অভিহিত করেন। নতুন ওই রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগী মারা যান ২০২০ এর ১০ জানুয়ারি। সংক্রমণের শিকার হওয়া বাকি ৪৭ জনও একই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করা হয়। ১২ জানুয়ারি ২০২০ এর মধ্যে চীনের অন্য প্রদেশগুলোতেও সংক্রমণের সংখ্যা বাড়তে থাকে। শুধু চীন নয়, হংকং, ম্যাকাউ, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাস সংক্রমণের বিষয়টি নিশ্চিত হয়। ২০২০ এর মার্চের শেষ পর্যন্ত উহানে ৯০ হাজারের বেশি আক্রান্ত হয়, মারা যায় ৪ হাজারেরও বেশি মানুষ। পুরো দুনিয়াকে অবরুদ্ধ করে দেয়া এই করোনা চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে পৃথিবীর প্রায় সবদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ওয়ার্ল্ডোমিটার এর তথ্যানুযায়ী, ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত বিশ্বের ২২১ টি দেশ ও অঞ্চলে কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়েছে, আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ১২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৮১ হাজার ১৬৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৮ লক্ষ ১৯ হাজার ২৮৪ জনের।

যেভাবে সংক্রমণের শুরু বাংলাদেশে:

সংক্রমণের শুরুতে বিদেশ ফেরত ব্যক্তি ও তাদের সংস্পর্শে আসা অন্যদের মধ্যে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ সীমিত থাকলেও দ্রুত তা ব্যাপকভাবে অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ২০২০ এর ৮ মার্চ যে তিনজন রোগী প্রথম শনাক্ত হন তাঁদের দুজন ছিলেন ইতালি ফেরত। অন্য একজন ইতালি ফেরত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন। তবে শুধু ইতালি নয়, কমপক্ষে আটটি দেশ থেকে আসা প্রবাসীর মধ্যে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছিল। তাদের মাধ্যমেই শুরুতে সংক্রমণ ছড়িয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। করোনাভাইরাসের ভয়াবহ দিক হলো মানুষের সংস্পর্শের মাধ্যমে এই ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং এ রোগের এখন পর্যন্ত কার্যকর কোন চিকিৎসা, ওষুধ বা নিশ্চিত কার্যকর ভ্যাকসিন আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। আরো ঝুঁকিপূর্ণ হলো ফ্রন্টলাইন কর্মীরা যেমন চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার আশঙ্কাজনক। শুধুমাত্র সংস্পর্শ প্রতিরোধই এই ভাইরাস থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়, যার অর্থ জনজীবনকে অবরুদ্ধ করে রাখা এবং সতর্কতা অবলম্বন করা। জরুরি সেবা যেমন, হাসপাতাল, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, জরুরি বিদ্যুৎ, পানি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ব্যতীত ব্যবসা, অফিস, স্কুল,কলেজ, যাতায়াত, মার্কেট- সবকিছু বন্ধ করে দিয়ে মানুষকে ঘরে দীর্ঘকালীন অন্তরীণ করে রাখা। আর এখানেই স্বাস্থ্যঝুঁকির সাথে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর জীবিকা তথা বেঁচে থাকার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও তাৎক্ষণিকতার সাথে যা করছে তা হল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা। ভয়ঙ্কর এই ভাইরাসের আক্রমণ থেকে প্রাণ বাঁচাতে এটি অতীব জরুরি ছিল। করোনাভাইরাস এর বিস্তার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ২৬ মার্চ ২০২০ থেকে ৩০ মে ২০২০ পর্যন্ত কয়েক দফা সাধারণ ছুটির আদলে লকডাউন বাস্তবায়ন করেছে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এটিকে সাধারণ ছুটি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। খাদ্য পরিষেবা ও ওষুধ কেনার মতো জরুরি পরিসেবা ব্যতীত জনগণের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি ছিল না। অপর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধাসহ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশে কোভিড-১৯ এর দ্রুত বৃদ্ধির আশঙ্কার কারণে সরকারের এই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। অন্যান্য দেশগুলি কোভিড-১৯ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হিসাবে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার উপর জোর দিয়েছে। বাংলাদেশও তা অনুসরণ করেছে।

আক্রান্ত, শনাক্ত ও মৃত্যু:

২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্তের কথা জানা যায়। শুরুর দিকে সংক্রমণ কম ছিল। ক্রমে সেটি বেড়েছে। মে মাসের মাঝামাঝি থেকে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হতে শুরু করে এবং জুনে সংক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করে। আগস্ট থেকে নতুন রোগীর সংখ্যা কমতে দেখা যায়। ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে সংক্রমণ আবার বাড়তে থাকে আর মার্চে মৃত্যু বাড়তে থাকে। গত বছরের জুলাই মাসে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রথম দফায় যখন চূড়ায় উঠেছিল, তখন এক দিনে সর্বোচ্চ রোগী শনাক্ত হয়েছিল ৪ হাজার ১৯ জন। ২৯ ও ৩০ মার্চ ২০২১ দেশে ৫ হাজারের বেশি রোগী শনাক্ত হয়েছে যা এ মুহূর্তে দেশে সর্বোচ্চ। ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত দেশে করোনাভাইরাসে নিশ্চিত আক্রান্তের সংখ্যা ৬ লাখ ছাড়িয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী এদিন পর্যন্ত ৬ লাখ ১১ হাজার ২৯৫ জনের দেহে এই ভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। সুস্থ হয়েছেন ৫ লক্ষ ৪০ হাজার ১৮০ জন। এর মধ্যে মারা গেছেন ৯ হাজার ৪৬ জন। জনস্বাস্থ্যবিদরা মনে করছেন, ইউরোপের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও করানোর সংক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। দৈনিক ক্রমবর্ধমান রোগীর সংখ্যা দেখে ধারণা করা হচ্ছে পরিস্থিতি গত বছরের জুন-জুলাইয়ের চেয়েও খারাপের দিকে যেতে পারে।

কোভিড নিয়ন্ত্রণ- সমন্বয়হীনতা, অব্যবস্থাপনার:

বাংলাদেশে করোনার মারাত্মক বিপর্যয়ের আশঙ্কা করা হলেও বাস্তবে তা ঘটেনি। কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ঘাটতির ভয়াবহ

চিত্রটি প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে করোনা পরিস্থিতি। স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়হীনতা এতটা প্রকট ছিল যে করোনা বিপজ্জনক রূপ নিলে আমরা হয়তো কোনভাবেই সামাল দিতে সক্ষম হতাম না।

কোয়ারেন্টিন বা সঙ্গনিরোধ, সামাজিক দূরত্ব বাস্তবায়ন: শুরুতেই যে সমন্বয়হীনতার চিত্রটি সামনে চলে আসে তা হলো বিদেশ ফেরতদের কোয়ারেন্টিন নিয়ে। এ বিষয়ে পরিষ্কার কোন ব্যবস্থাপনা ছিল না। ফেব্রুয়ারি ২০২০-এ চীন থেকে আসা ৩১২ জন প্রবাসীকে আশকোনা হজ্জ্ব ক্যাম্পে কোয়ারেন্টিনে রাখা নিয়ে উদ্ভূত সমস্যার প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ ওঠে। ২০২০ এর ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে বিশ্বে করোনার ব্যাপক বিস্তারের ফলে ইউরোপ, বিশেষ করে ইতালি, মধ্যপ্রাচ্য ও ভারত থেকে প্রবাসীদের ফিরে আসার ঢল নামে। এর ফলে দেখা যায় স্থলবন্দর, বিমানবন্দর, নৌবন্দর কোথাও যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য পর্যাপ্ত থার্মাল স্ক্যানার ছিলনা এবং যেগুলো ছিল তা অনেক সময় নষ্ট দেখা গেছে। এক পর্যায়ে বিপুল প্রবাসীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে খেই হারিয়ে ফেলে বন্দর কর্তৃপক্ষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী বিদেশ ফেরতদের ১৪ দিন প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন রাখার কথা বলা হলেও এত বিপুল সংখ্যক প্রবাসীদের কোয়ারেন্টিন রাখার কোন প্রস্তুতি ছিল না সরকারের পক্ষ থেকে। হজ্জ্ব ক্যাম্পে ইতালি প্রবাসীদের (সেই সময়ে ইতালি ছিল করোনার হটস্পট এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে ইতালি ফেরতদের মাধ্যমেই দেশে করোনা বিস্তার লাভ করে) কোয়ারেন্টিন নিয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষও হয়। সরকার অনেকটা বাধ্য হয়ে প্রবাসীদের হোম কোয়ারিন্টেনে রাখার উদ্যোগ নেয় এবং স্থানীয় প্রশাসনকে বিদেশ ফেরতরা কোয়ারিন্টেন ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছে কিনা তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে বিদেশ ফেরতরা বিয়ে, বাজার-ঘাট, মসজিদ সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এত

ছড়িয়ে থাকা প্রবাসীদের ঘরে আটকে রাখা ও তদারকি করা সম্ভব ছিল না। এছাড়া যে প্রবাসীর বাড়িতে একটি বা দুটি ঘর তাকে কী করে কোয়ারেন্টিনে রাখা যাবে সে প্রশ্নও উঠে আসে। তদুপরি বিদেশ ফেরতরা নিজেরা চরম অসচেতনতার পরিচয় দিয়ে স্বাস্থ্যবিধি যেমন- মাস্ক পরিধান, সঙ্গনিরোধ ইত্যাদি মেনে চলেননি। অনেকে বিদেশ থেকে আসার কথা গোপনও করেছেন। ফলে ঢাকা ও স্থানীয় পর্যায়ে ২০২০ এর মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে করোনার ব্যাপক বিস্তার শুরু হয়।

লকডাউন বা সাধারণ ছুটি:

করোনার বিস্তার রোধে সরকার ২৬ মার্চ ২০২০ থেকে সারাদেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাধারণ ছুটি (আদতে লকডাউন) জারি করে। কয়েক দফা বৃদ্ধির মাধ্যমে জুন পর্যন্ত লকডাউন বলবৎ থাকে। লকডাউনে চিকিৎসা ও অন্যান্য জরুরি সেবা ছাড়া সরকারি, বেসরকারি অফিস, শিল্প প্রতিষ্ঠান, মার্কেট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চিকিৎসা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য কেনা-কাটা ব্যতীত জনসাধারণকে ঘরের বাইরে বের হওয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেয়া হয়। লকডাউন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের অব্যবস্থাপনা ও দূরদৃষ্টির ব্যাপক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। দেশে দৈনিক আয়ের ওপর নির্ভরশীল ও দরিদ্র লক্ষ লক্ষ মানুষের খাদ্য নিশ্চিতের ন্যূনতম পরিকল্পনা ছাড়াই লকডাউন বাস্তবায়নে নামে সরকার। ফলে এক সপ্তাহ না যেতেই ক্ষুধার্ত ও অসহায় মানুষ কাজ ও খাবারের সন্ধানে রাস্তায় নেমে আসে। লকডাউনের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জরুরি খাদ্য সহায়তা দেয়া শুরু হয় তবে তা ছিল বিচ্ছিন্ন ও চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত। পুরো লকডাউন জুড়েই একদিকে খাবারের সন্ধানে মরিয়া দরিদ্র জনসাধারণ রাস্তায় নেমে আসা অন্যদিকে পুলিশ ও প্রশাসনের মানুষকে ঘরে ফেরানোর প্রানান্তকর চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

করোনার সংক্রমণ রোধে লকডাউনের কার্যকারিতাকে প্রথমেই প্রশ্নবিদ্ধ করে লক্ষ লক্ষ মানুষের গ্রামে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা। লকডাউন ঘোষণা হতেই কাজ ও খাবারের অনিশ্চয়তায় শহরগুলো থেকে বিশেষ করে ঢাকা থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ গ্রামে ফিরতে শুরু করে। লকডাউন শুরু হওয়ার পূর্বের কয়েকদিন ধরে বাসে ট্রেনে গ্রামমুখী মানুষের উপচে পড়া ভীড় পরিলক্ষিত হয়। যেখানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা তো দূরের কথা, তিল ধারণেরও জায়গা ছিল না। অন্যদিকে লকডাউনের একমাস যেতে

না যেতেই গার্মেন্টসসহ ক্ষুদ্র কারখানা/ প্রতিষ্ঠান অনেকক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা না মেনেই খুলতে শুরু করায় আবার শহরে ফিরতে শুরু করে মানুষ। সাধারণ পরিবহন বন্ধ থাকায় মানুষ পায়ে হেঁটে, ভেঙে ভেঙে বিভিন্নভাবে শহরে ফিরতে থাকে। আদতে গ্রামেও জীবিকা তথা খাদ্যাভাবের কারণে মানুষের শহরে না ফিরে কোন উপায়ও ছিল না। তারা জানে শহরে অন্তত কোন না কোনভাবে কিছু করা যাবেই। জনমানুষের এই ফেরা ঠেকাতে প্রানান্তকর চেষ্টা চালায় পুলিশ। ফলশ্রুতিতে পুলিশ সদস্যরা ব্যাপকভাবে করোনায় আক্রান্ত হয়। পেশাজীবীদের মধ্যে পুলিশ সদস্যরাই সবচেয়ে বেশি মারা যায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে।

অন্যদিকে ঢাকায় সাধারণ পরিবহণ, রিক্সা, সিএনজি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকায় অসুস্থ, কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা নিতে গিয়ে দুর্ভোগে পড়তে হয়। জরুরি প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়া মানুষকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চেকপোস্টে হয়রানির শিকার হতে হয়। অন্যদিকে অতি উৎসুক মানুষের জরুরি প্রয়োজনের নামে অহেতুক ঘোরাঘুরি প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটায়। মে মাসের শুরুতে লকডাউন কিছুটা শিথিল করে এলাকা/ অঞ্চলভিত্তিক লকডাউনের পরিকল্পনা নেয়া হয়, তবে ঢাকার দু'টি এলাকা ব্যতীত তা বাস্তবায়নে কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি।

মাস্ক ব্যবহার, সামাজিক দূরত্ব ও জনসচেতনতা:

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় কার্যকর কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায় এই ভাইরাস থেকে নিজেকে দূরে রাখাই একমাত্র প্রতিরোধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী মাস্ক ব্যবহার, ৩ ফুট সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, জনসমাগম এড়িয়ে চলা, আক্রান্তদের সঙ্গনিরোধ বা কোয়ারেন্টিন রাখা হলো একমাত্র কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা। কিন্তু বাংলাদেশের মতো একটি ঘনবসতিপূর্ণ, দরিদ্র দেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন বাস্তবায়ন কঠিন কাজ। তদুপরি বেশিরভাগ মানুষ, বিশেষ

> পুলিশ ও প্রশাসনের কঠোর চেষ্টা সত্ত্বেও মাস্ক পরা ও সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে জনগণ কখনোই আগ্রহী হয়নি। সাধারণ ছুটি বা লকডাউনের সময় জীবিকার দায়ে দরিদ্র মানুষ রাস্তায় বের হলেও অতি উৎসাহী শিক্ষিত সচেতন মানুষকেও লকডাউন ভেঙে রাস্তাঘাটে জনসমাগম স্থলে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে সবসময়।

করে ঢাকার বাইরে জেলা শহর ও গ্রামের মানুষের মধ্যে এসব নির্দেশনা মেনে চলার মত সচেতনতার কোন চেষ্টাই ছিল না। পুলিশ ও প্রশাসনের কঠোর চেষ্টা সত্ত্বেও মাস্ক পরা ও সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে জনগণ কখনোই আগ্রহী হয়নি। সাধারণ ছুটি বা লকডাউনের সময় জীবিকার দায়ে দরিদ্র মানুষ রাস্তায় বের হলেও অতি উৎসাহী শিক্ষিত সচেতন মানুষকেও লকডাউন ভেঙে রাস্তাঘাটে, যত্রতত্র ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে সবসময়। মাস্ক পরা নিয়ে সরকার প্রানান্তকর চেষ্টা করলেও মানুষ ছিল নির্বিকার এবং মাস্ক না পরা নিয়ে তাদের নানাবিধ অজুহাত দেখা গেছে। থুতনিতে মাস্ক ঝুলিয়ে রাখা ছিল খুবই সাধারণ একটি চিত্র। এমনকি হাসপাতালের মতো সংবেদনশীল জায়গাতেও রোগী ও স্বজনদের মাস্ক পড়া নিশ্চিত করতে চিকিৎসক/ হাসপাতাল কর্মীদের গলদঘর্ম হতে হয়েছে সবসময়।

করোনা নিয়ে সঠিক তথ্য না জেনে অহেতুক আতঙ্ক তৈরির প্রবণতা দেখা যায় শুরুর দিকে। যার কারণে আক্রান্তদের অমানবিক দুর্ভোগ ও মানসিক যন্ত্রণায় পড়তে হয়। গাজীপুরের এক নারী বেশ কিছুদিন ধরে জ্বর ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। চিকিৎসার জন্য স্বামীকে নিয়ে গাজীপুর থেকে সাভার পৌর এলাকায় বাবার বাড়িতে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু তার উপসর্গের কথা জেনে এলাকার কয়েকজন স্বামীসহ ওই নারীকে এলাকাছাড়া করেন। গাজীপুরের আরেকটি ঘটনায় দেখা যায় ফার্মেসিতে রক্তচাপ মাপতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে গিয়ে এক নারী মারা যান। করোনা আতঙ্কে মধ্যরাত পর্যন্ত লাশ রাস্তায় পড়ে থাকে। এরকম আরো অনেক ঘটনা গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যম থেকে জানা গেছে। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর গোপন করার প্রবণতাও দেখা যায় সাধারণের মাঝে। ঢাকার কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৬৩ বছরের এক মাদ্রাসা প্রধান মারা যান ২০২০ এর মে মাসে। পরিবারের সদস্যরা করোনার তথ্য গোপন করে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় লাশ দাফন করলে উপজেলার শিয়ালদি নামে একটি গ্রাম উপজেলা প্রশাসন লকডাউন করতে বাধ্য হন।

নারায়ণগঞ্জের এক নারী চিকিৎসক করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে ঝুঁকি নিয়ে আক্রান্ত ও সন্দেহভাজনদের চিকিৎসা দিয়ে আসছিলেন। কিন্তু সেই চিকিৎসকের মা-বাবা, ভাইসহ পরিবারের ১৭ জন করোনায় আক্রান্ত হলে স্থানীয় কিছু লোক নারায়ণগঞ্জে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার জন্য হয়রানি ও হামলার চেষ্টা করেন। প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ঐ পরিবারকে আতঙ্কে কাটাতে হয়। উল্লেখ্য যে, করোনা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক আক্রান্ত ব্যক্তি নিজ বাসা বা ফ্ল্যাটে চিকিৎসা নিয়েছেন। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাটের অন্য বাসিন্দাদের বাধা দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। এমনকি করোনা রোগীদের চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক ও নার্সদের ফ্ল্যাটে উঠতে বাধা দেয়ার ঘটনাও ঘটেছে। অন্যদিকে করোনায় মৃতদের সৎকারে পরিবারের কেউ এগিয়ে না আসার ঘটনাও ঘটেছে অনেক। এমনকি করোনায় মৃত হিন্দুধর্মাবলম্বীর পরিবারের কেউ এগিয়ে না আসায় মুসলমান ধর্মাবলম্বী স্বেচ্ছাসেবকদের লাশ সৎকার করার ঘটনাও উঠে এসেছে। করোনা সন্দেহে মাকে রাস্তায় ফেলে সন্তানদের পালিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও দেশে আতঙ্ক ছড়াতে সহায়তা করেছে।

করোনা নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন:

করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগসহ ১৫টি মন্ত্রণালয় শুরু থেকে সক্রিয় হয়ে কাজ করেছে। করোনাভাইরাস জনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ১৭ সদস্যের 'জাতীয় কারিগরি কমিটির পরামর্শক কমিটি' গঠন করে সরকার। এই কমিটি দেশের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পাঁচটি উপকমিটি তৈরি করে। উপকমিটিগুলো কোভিড-১৯ রোগীর চিকিৎসা, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা, ল্যাবরেটরি ও ডায়াগনস্টিক, মানসিক স্বাস্থ্য এবং রোগতত্ত্ব ও গবেষণা বিষয়ে পৃথক প্রতিবেদন ও সুপারিশমালা তৈরি করে। তবে সেই প্রতিবেদন বা সুপারিশ বাস্তবায়নের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না এমন অভিযোগ এসেছে অনেকবার। ২০২০ এর মে মাসে করোনা সংক্রমণের হার সর্বোচ্চ থাকলেও মানুষ যখন ইচ্ছা তখন রাস্তায় বের হয়েছে, হাটবাজারে ঘুরেছে, ত্রাণ নিতে ভিড় জমিয়েছে। এসব নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আসলে কার তা নিয়ে সবসময়ই প্রশ্ন উঠেছে। মানুষ মনে করছে, মন্ত্রণালয়গুলো সমন্বিতভাবে কাজ করছে না। এই ধারণা সত্যি হয়ে ওঠে যখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁকে কোভিড-১৯ বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান করা হলেও তিনি অনেক কিছু জানেন না। গার্মেন্টস খোলা বা বন্ধ রাখা, মসজিদে নামাজ আদায় বা রাস্তা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত কিভাবে নেয়া হচ্ছে, তা তিনি জানেন না।

করোনা মোকাবেলা বিশেষজ্ঞ কমিটি ও টাস্কফোর্স গঠন এবং প্রায় প্রতিদিন এক বা একাধিক প্রজ্ঞাপন জারি ছাড়া মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে দৃশ্যমান পরিবর্তন চোখে পড়েনি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ সবাই কোভিড পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ানোর কথা বললেও বাস্তবে তা ক্রমাগত কমেছে। সময়মতো মেলেনি পরীক্ষার রিপোর্ট। পাঁচ থেকে সাত দিন অপেক্ষার অনেক নজির রয়েছে। এমনকি রিপোর্টের জন্য ১৪ দিন অপেক্ষারও উদাহরণ আছে। অন্যদিকে হাসপাতালে গেলে জীবন ঝুঁকিতে পড়বে,

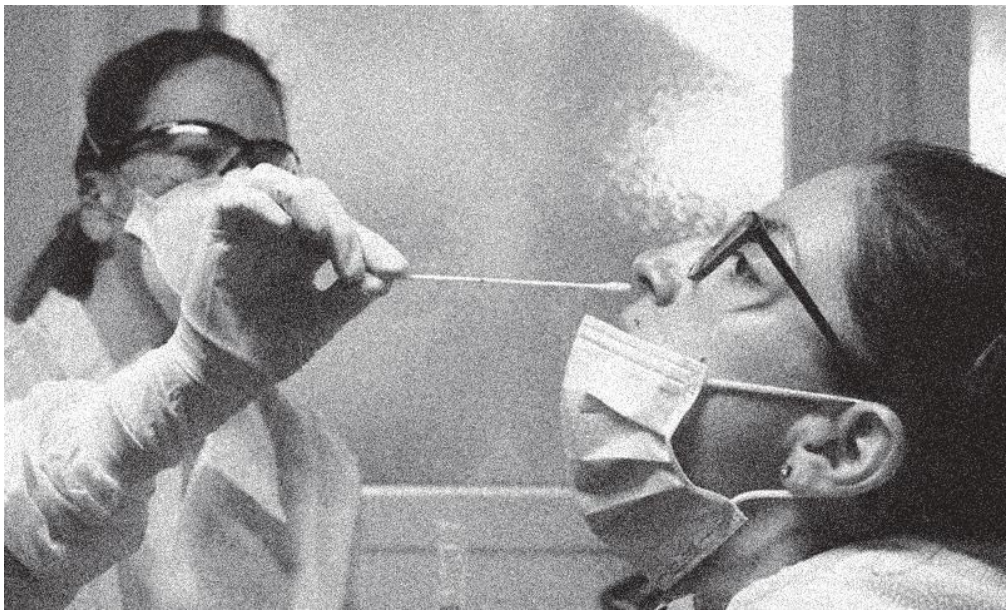

এমন আশঙ্কায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা হাসপাতালে যেতে চাননি। কোভিড চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত হাসপাতালগুলোর শয্যা ফাঁকা পড়ে ছিল, অথচ এসব হাসপাতালের জন্য মাসে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে সরকার। স্বাস্থ্যবিধি মানতে নানা রকম আদেশ-নির্দেশ জারি হলেও হাটবাজার, রাস্তাঘাটসহ জনাকীর্ণ স্থানগুলোতে বেশিরভাগ মানুষ মাস্ক ব্যবহার করতে বা সামাজিক দুরত্ব মেনে চলতে দেখা যায়নি। একই সাথে এটিও সত্য যে, কোভিড-১৯ এর মতো দুর্যোগ সরকারের একার পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। তবে সরকারকে সে বিষয়ে বিচলিত হতে দেখা যায়নি। এনজিও বা সমাজের অন্যান্য শক্তিকে যুক্ত করার তেমন কেনো উদ্যোগ সরকারের তরফ থেকে দেখা যায়নি। কোভিড সংক্রমণ, আক্রান্তদের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও মৃত্যু সম্পর্কে তথ্যপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণ সরকার নিজের হাতে রাখার একটি প্রবণতা দেখা গেছে।

করোনা শনাক্ত ব্যবস্থাপনা:

নমুনা সংগ্রহ: পরীক্ষা যত বেশি হবে আক্রান্ত ব্যক্তিও তত বেশি শনাক্ত হবে। রোগী শনাক্ত হলে এবং এরপরের ধাপগুলো কন্টাক্ট ট্রেসিং (আক্রান্তের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা), কোয়ারেন্টিন (সঙ্গনিরোধ) ও আইসোলেশন (বিচ্ছিন্ন থাকা) যথাযথ ভাবে পালন করা হলে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব- এটি ছিল করোনা সংক্রমণ রোধের এ যাবৎকালের স্বীকৃত পন্থা। কিন্তু দেশে নমুনা পরীক্ষা কম হওয়ায় সংক্রমণের প্রকৃত চিত্র উঠে আসেনি। শুরু থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ঢিলেঢালা ভাব, সিদ্ধান্তহীনতা ও ভুল সিদ্ধান্তের কারণে কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষায় বিশৃঙ্খলা ছিল সবসময়। প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি নেয়া আছে, এমন কথাই ধারাবাহিকভাবে বলা হচ্ছিল সরকারের পক্ষ থেকে। কিন্তু রোগীর চাপ কিছুটা বেড়ে যেতেই ভেঙে পড়ে নমুনা পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা। এমনও দেখা গেছে যে নমুনা পরীক্ষার সিরিয়াল পেতে ভোর রাত থেকে রোগীদের লাইনে দাঁড়াতে। আবার লাইনে দাড়ানোর পর হঠাৎ করে নমুনা নেয়া বন্ধ করে দেয়ায় বাকবিতণ্ডা, হয়রানির চিত্র সবসময়ই গণমাধ্যমে উঠে এসেছে। নমুনা পরীক্ষার ফল নিয়েও ভোগান্তিতে পড়তে হয় ভুক্তভোগীদের। শুরুর দিকে রোগীকে নমুনা দেয়ার ৩ দিন থেকে ৫ দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। এমনকি রোগীর মৃত্যুর পরও নমুনার ফলাফল পাওয়া গেছে। একটি পর্যায়ে বেসরকারি মাধ্যমে করোনা পরীক্ষার অনুমতি দেয়া হলেও অতিরিক্ত খরচের বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা হয়। সেই সাথে রিজেন্ট হাসপাতাল ও জেকেজি'র নমুনা পরীক্ষা নিয়ে দুর্নীতির কারণে মানুষের মধ্যে আস্থাহীনতা তৈরি হয়। আবার দক্ষ টেকনোলজিস্ট ও উপকরণ না থাকায়

সংক্রমণ দ্রুত বাড়তে থাকলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তড়িঘড়ি করে অনেকগুলো পরীক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগেরই মানসম্মত সরঞ্জাম, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মী না থাকায় পরীক্ষার কাজটি যথাযথ ভাবে করা যায়নি। দেখা গেছে লোকবলের ঘাটতি থাকায় অনেক কেন্দ্রে নমুনা পরীক্ষার্থীদের দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নমুনা পরীক্ষার ফল পাওয়া গেছে রোগীর মৃত্যুর পর।

সংগৃহীত নমুনা প্রায়শই নষ্ট হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠে আসে। এক হাসপাতালে কোভিড পজেটিভ হওয়ার রিপোর্ট ২ দিন পর আরেক হাসপাতালে নেগেটিভ রিপোর্ট হয়ে যাওয়ার মতো অনেক অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রতিদিন কোন না কোন পরীক্ষাকেন্দ্র বন্ধ রাখতে হয়েছিল যন্ত্রপাতি ঠিক কাজ না করার জন্য। এছাড়া শুক্র ও শনিবার বা সরকারি ছুটির দিনে অনেক নমুনা সংগ্রহ কেন্দ্র বন্ধ রাখা হতো।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে গত ১৬ মার্চ ২০২০ যে বার্তাটি দেওয়া হয়েছিল তা ছিল পরীক্ষা, পরীক্ষা, পরীক্ষা। কিন্তু সেই বার্তা উপেক্ষিত থেকেছে। দৈনিক প্রথম আলোয় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায়, বাংলাদেশে প্রতি ১০ লাখ মানুষের মধ্যে গড়ে ৮৭৮ জনের করোনাভাইরাস শনাক্তকরণের পরীক্ষা হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ায় আটটি দেশের মধ্যে এর চেয়ে কম পরীক্ষা হচ্ছে শুধু আফগানিস্থানে। অন্যদিকে দক্ষ টেকনিশিয়ানের অভাব ও অব্যবস্থাপনার কারণে দেশের ল্যাবরেটরিগুলোর সক্ষমতার অর্ধেকই অব্যবহৃত থেকে গেছে। আবার আক্রান্ত, শনাক্তের হার কম দেখানোর জন্য নমুনা পরীক্ষা কম করারও প্রবণতা দেখা গেছে। বেশি বেশি পরীক্ষার মাধ্যমে কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং এর মাধ্যমে করোনা ভাইরাসকে ছড়িয়ে পড়তে না দেয়ার সঠিক প্রক্রিয়া থেকে সরে আসে। এমনকি করোনা পরীক্ষা যাতে কম হয় সেজন্য ১০০ টাকার পরিবর্তে ২০০ টাকা ফিও ধার্য করা হয়। এই ফি ধার্য করার কারণে অনেকে করোনা পরীক্ষা থেকে দূরে থাকছে।

আইইডিসিআর এর একক নেতৃত্ব:

করোনা সংক্রমণের শুরু থেকেই রোগতত্ত্ব ও রোগনিয়ন্ত্রণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা আইইডিসিআর'র হাতে করোনা পরীক্ষার যাবতীয় নিয়ন্ত্রণের একক কর্তৃত্ব দেয়া হয়। এরকম একটি জনবহুল দেশে আইসিডিডিআর'র মতো পরীক্ষা করার সামর্থ্য ও সক্ষমতা আছে, এমন প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই প্রক্রিয়ায় শুরু থেকে যুক্ত করা হয়নি। সংক্রমণ দ্রুত বাড়তে থাকলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তড়িঘড়ি করে অনেকগুলো পরীক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগেরই মানসম্মত সরঞ্জাম, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মী না থাকায় পরীক্ষার কাজটি যথাযথভাবে করা যায়নি। দেখা গেছে লোকবলের ঘাটতি থাকায় অনেক কেন্দ্রে নমুনা পরীক্ষার্থীদের দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নমুনা পরীক্ষার ফল পাওয়া গেছে রোগীর মৃত্যুর পর। শুরু থেকে আইইডিসিআরের মতো একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগানো উচিত ছিল পরীক্ষার মাননিয়ন্ত্রণ, তদারকি, লোকবল প্রশিক্ষিত করার মতো কাজে। সেটা করা হলে যেসকল নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে, সেগুলোর মান নিয়ে প্রশ্ন উঠত না। সংক্রমণের মাত্রা যখন উচ্চপর্যায়ে পৌঁছায় তখন আইইডিসিআরকে নমুনা পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য সরঞ্জাম, নমুনা পরীক্ষার কিট সঙ্কট:

বছর জুড়ে কিট সঙ্কট ও এর সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি ছিল নিয়মিত। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রথম দিকে নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিং-এ গৃহীত ব্যবস্থা নিয়ে অবহিত করতো। কিন্তু নিয়মিত ব্রিফিং-এ নমুনার পরীক্ষার কিটসহ অন্যান্য বিষয়ে বিভ্রান্তকর তথ্য নিয়ে প্রশ্নের প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের প্রশ্ন করার সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে সংবাদ ব্রিফিং-এ সাংবাদিকদের অংশগ্রহণই বাদ দেয়া হয়। কিট সঙ্কটের কারণে অনেক পরীক্ষাগারে কম নমুনা সংগ্রহ বিশেষ করে ঢাকার বাইরে অনেক পরীক্ষাগারে নমুনা নেয়া বন্ধ হয়ে যায়।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, পিপিই)'র অপ্রতুলতা ও মানহীনতা:

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সবচেয়ে সম্মুখ সারির যোদ্ধা ডাক্তার, নার্স ও হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীদের জন্য সবচেয়ে জরুরি হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত মানসম্মত মাস্ক, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) ইত্যাদি। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো কোভিড-১৯ সংক্রমণের শুরু হতেই পর্যাপ্ত সুরক্ষা সামগ্রীই নিশ্চিত করা যায়নি। আবার সরবরাহকৃত সামগ্রীর মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে খোদ চিকিৎসকদের কাছ থেকে। সরকারি তথ্য মতে চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে সাড়ে চার লাখের বেশি পিপিই বিতরণ করা হয়েছিল এপ্রিল ২০২০ এর শুরুতে। তবে করোনার চিকিৎসায় সম্মুখ সারির এসব কর্মীর সবাই এই সামগ্রী পাননি বলে অভিযোগ আসে, এছাড়া পিপিইর মান নিয়েও প্রশ্ন উঠে। অভিযোগ এসেছে যে, হাসপাতাল কর্মীদের পিপিই হিসেবে অতি সাধারণ কাপড়ের তৈরি গাউন ও পাজামা দেওয়া হয়েছে। তাতে পানি ঢাললে চুইয়ে পড়ে। একদিকে যখন সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা যাচ্ছিলনা তখন শুল্ক পরিশোধের জটিলতায় বিমানবন্দরে ৫০ হাজার ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) ও অক্সিজেন পরিমাপের যন্ত্র আটকে ছিল মাসের পর মাস। গণমাধ্যমে প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত সেগুলো ছাড়িয়ে আনার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও টিকা কর্মসূচির কর্মীদের মাস্ক ও গ্লাভস সরবরাহ বন্ধ থাকায় টিকাদান কর্মসূচি বন্ধ ছিল অনেকদিন। এতে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকির পাশাপাশি মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যে বিরূপ প্রভাব পড়েছে।

নিম্নমানের মাস্ক নিয়েও আলোচনা ছিল বছর জুড়ে। একটি প্রতিষ্ঠান এন-৯৫ এর নাম করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে নকল মাস্ক সরবরাহ করা হয়েছিল। খুলনা মেডিকেল কলেজ এবং মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক এর প্রতিবাদ করার ফলে মাস্ক প্রত্যাহার করা হয়। একই সাথে এই ঘটনা প্রকাশ করার ফলে একজনকে বদলী এবং অন্যজনকে ওএসডি করা হয়।

২০২০ এর এপ্রিলের শুরু থেকে নিয়মিতভাবে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা বাড়তে থাকে। হাসপাতালে মৃত্যু বাড়তে থাকে। একাধিক হাসপাতালে ঘুরে ভর্তি হতে না পেরে মৃত্যুর ঘটনা মানুষের মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। এ রকম একাধিক ঘটনায় মানুষের মধ্যে ভয়-সংশয় দানা বাঁধতে থাকে। মানুষ জানতে পারে হাসপাতালে শয্যা খালি নেই, অক্সিজেন নেই। এসব সংবাদকে পেছনে ফেলে গণমাধ্যমে জায়গা করে নেয় জেকেজি ও রিজেন্ট হাসপাতালের দুর্নীতি। নিয়মনীতি ও আইন অনুসরণ না করে এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে করোনা পরীক্ষা ও করোনা রোগীর চিকিৎসার অনুমতি দিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। পরে জানা যায়, এসব ক্ষেত্রে আর্থিক দুর্নীতিও হয়েছে। দুর্নীতি হয়েছে দাতাদের অর্থে পরিচালিত প্রকল্পেও। বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে করোনা মোকাবিলায় দুটি পৃথক প্রকল্প হাতে নেয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। প্রতিটি প্রকল্প ছিল ৮৫০ কোটি টাকার। সেসব প্রকল্পেও দুর্নীতি হয়েছে। এসব ঘটনায় স্বাস্থ্য খাতে নেতৃত্বের ঘাটতি প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

হাসপাতাল প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা:

সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য সাধারণ ছুটি বা লকডাউনের সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেনি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। ২৬ মার্চ ২০২০ থেকে দেশে সাধারণ ছুটি শুরু হলেও কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল তৈরিতে অনেক দিন সময় লেগেছে। শুরুর দিকে সরকারি কয়েকটি হাসপাতাল নিয়ে কোভিড রোগীর চিকিৎসা শুরু হয়। জেলা শহরে সরকারি হাসপাতালে কোভিড ইউনিট চালু হলেও তাতে ছিলনা প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, চিকিৎসক বা প্রশিক্ষিত কর্মী।

শুরুতে ঢাকায় মুগদা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতাল এবং কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল কোভিড-১৯ রোগীদের জন্য নির্ধারণ করা হয়। পরে আরো কয়েকটি হাসপাতলে করোনা রোগীর চিকিৎসা শুরু হয়।

২০২০ এর এপ্রিল এর শুরুতে করোনা রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থা এক ভৌতিক রূপ লাভ করে। নামে করোনা ডেডিকেটেড হলেও ঢাকার এসব হাসপাতালে করোনা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় উপকরণ, চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর সংকট ছিল। এছাড়া করোনা আতঙ্কের কারণে চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্যরাও রোগীর প্রয়োজনীয় পরিচর্যা দিতে দ্বিধায় ভুগছিল। এমনও হয়েছে বিকালে ভর্তি হওয়া রোগী রাতে মারা গেছে। সকালে লাশ দাফন করে পরিবারকে এসএমএস এর মাধ্যমে পরিবারকে মৃত্যুর খবর জানানো হয়েছে। হাসপাতালে শ্বাসকষ্টের রোগীকে অক্সিজেন, ভেন্টিলেটর সেবা দেয়ার মতো কর্মী নেই এরকম খবরও উঠে এসেছে। এমনকি কর্তব্যরত চিকিৎসদের খাবার প্রদানেও কর্তৃপক্ষ কোন উদ্যোগ না নেয়ায় চিকিৎসকের একটি দলকে খাবার সরবরাহের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। অন্যদিকে প্রতিটি জেলায় নামে মাত্র আইসোলেশন ইউনিট খোলা হলেও সেখানে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ছিলনা এমনকি অনেক জেলায় চিকিৎসকরা মানসম্মত স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রীও ঠিকমতো পাননি। অন্যদিকে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কোভিড-১৯ মোকাবেলায় যথাযথ প্রশিক্ষণ না থাকায় করোনা রোগীর সেবায় হিমশিম খেতে হয়েছে। মে মাসের একটি দৈনিকের প্রতিবেদন থেকে জানায় যায় কুর্মিটোলা হাসপাতালে ২৭টি ভেন্টিলেটরের মধ্যে ১০টির বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে না। এই ভেন্টিলেটর না ব্যবহৃত হওয়ার কারণ হিসেবে দেখা যায় কারিগরিভাবে দক্ষ জনবলের অভাব। অন্যদিকে চিকিৎসকদের নানা সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে সেবা দিতে হয়েছে। চিকিৎসক স্বল্পতার কারণে কুর্মিটোলা হাসপাতালে ইউনানি, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথির অন্তত ২০ জন চিকিৎসক কোভিড-১৯ চিকিৎসায় যুক্ত করতে হয়েছিল।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেছে, কোভিড-১৯ রোগীর জন্য কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ৫০০ শয্যা ও কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতালে ২০০ শয্যা প্রস্তুত আছে। কিন্তু বাস্তবে হাসপাতালগুলো সব শয্যা ব্যবহার করতে পারেনি। একদিকে চিকিৎসকের সঙ্কট, অন্যদিকে চিকিৎসকেরা টানা ১০ দিন কাজ করে ১৪ দিন কোয়ারেন্টিনে থাকার কারণে চিকিৎসক সঙ্কট আরো

ঘণীভূত হয়। আবার ৫০ বছর বা তার বেশি বয়সী চিকিৎসকেরা করোনা রোগীদের চিকিৎসায় যুক্ত না করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। সে কারণে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়েছে মূলত ৫০ বছরের কম বয়সী চিকিৎসকদের। এতে বিশেষায়িত সেবার ঘাটতি থেকে গেছে।

আইসিইউ শয্যা অক্সিজেন সরবরাহে ঘাটতি:

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী মার্চ ২০২০ এ ঢাকার ৯টি সরকারি হাসপাতালে আইসিইউ ছিল ৯৫টি। যা মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ১৩২টিতে উন্নিত হয়। ঢাকাসহ সারাদেশে আছে আইসিইউ বেড এর সংখ্যা ৪৩২টি। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে ৭ শতের বেশি আইসিইউ রয়েছে। সংকটাপন্ন রোগীকে ভেন্টিলেটরের মাধ্যমে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস দিতে এই আইসিইউ ব্যবহৃত হয়। বৈশ্বিক চিত্র অনুযায়ী ১০-১৪ শতাংশের আইসিইউ ভেন্টিলেটরের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এছাড়া সকল হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহে ঘাটতি রয়েছে। শ্বাসতন্ত্রের রোগ কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের অবস্থা জটিল হলে কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন দিতে হয়। সরকারি হিসাব বলছে, রোগী সামলাতে হাসপাতালগুলোতে অক্সিজেন সিলিন্ডার যা দরকার, আছে তার অর্ধেক। ঘাটতি আছে আনুষঙ্গিক সরঞ্জামেরও। বেশিরভাগ জেলা হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিন্ডার থাকলেও অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব রয়েছে।

হাসপাতালে হাসপাতলে ঘুরে ঘুরে মৃত্যু:

এপ্রিলের ২য় সপ্তাহে শ্বাসকষ্ট নিয়ে রাজধানীর কুর্মিটোলা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন মনির হোসাইন। সেখান থেকে তাদের ঢাকা মেডিকেলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। ঢাকা মেডিকেলে এসে দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর অ্যাম্বুলেন্সেই তিনি মারা যান। কিশোরগঞ্জের তাসলিমা বেগমের জ্বর নেই, তবে শ্বাসকষ্টসহ নানা জটিলতা ছিল। তাসলিমাকে নিয়ে তাঁর স্বামী আলাল মিয়া তিন দিন রাজধানীর কয়েকটি হাসপাতাল ঘোরেন। তিনদিন ঘুরে তাসলিমার ঠাই হয় শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের কোভিড আইসোলেশন ওয়ার্ডে।

রাস্তায় ঘুরে ঘুরে মারা যান খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব গৌতম আইচ সরকার। অভিযোগ উঠেছে, কিডনির জটিলতায় অসুস্থ হলেও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল তাঁকে ভর্তি করাতে রাজি হয়নি। কিন্তু অক্সিজেনের খুব বেশি দরকার হওয়ায় নিরুপায় হয়ে তাঁকে কোভিড-১৯ রোগের চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি মারা যান।

রাস্তায় ঘুরে ঘুরে মারা যান খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব গৌতম আইচ সরকার। অভিযোগ উঠেছে, কিডনির জটিলতায় অসুস্থ হলেও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল তাঁকে ভর্তি করাতে রাজি হয়নি। কিন্তু অক্সিজেনের খুব বেশি দরকার হওয়ায় নিরুপায় হয়ে তাঁকে কোভিড-১৯ রোগের চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি মারা যান। তবে তাঁর কোভিড-১৯-এর উপসর্গ ছিল না বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে। এপ্রিল- জুন ২০২০- সময়ে এ রকম অভিযোগ আরও পাওয়া গেছে। চিকিৎসার জন্য গেলে কিছু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগী করোনায় আক্রান্ত কি না, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য সনদ দেখতে চাইছে। করোনা পরীক্ষাও সহজে করানো যাচ্ছে না, সনদ পাওয়াও কঠিন। আবার ভর্তি রোগী করোনায় আক্রান্ত জানার পর হাসপাতাল ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে, এমন অভিযোগও আছে।

কেন মানুষ হাসপাতাল সেবায় আস্থা হারাচ্ছে:

সাধারণ মানুষেরও হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য খাতের ওপর আস্থা নেই, এমন ধারণা অনেকের মধ্যেই ছিল। গবেষকেরা বলছেন, স্বাস্থ্য খাতের ওপর খুব কম মানুষ আস্থা রাখেন। করোনাকালে বাংলাদেশে জাতিসংঘ যুব ও ছাত্র অ্যাসোশিয়েশনের সহায়তায় একটি গবেষণায় দেখা গেছে, স্বাস্থ্য খাতের ওপর ২৪ শতাংশ মানুষের আস্থা নিম্ন পর্যায়ে। আস্থা আছে মাত্র ২৩ শতাংশের। আর বাকি ৫৩ শতাংশের আস্থা মাঝারি পর্যায়ের। এর সাক্ষ্য বহন করে মে মাসের দিকেই করোনা হাসপাতালে খালি শয্যা। করোনায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য সরকার সারা দেশে কিছু হাসপাতাল নির্ধারণ করে দিয়েছিল। এ ছাড়া এই রোগীদের চিকিৎসার জন্য বেশ কিছু হাসপাতালে শয্যা আলাদা রাখা হয়েছিল। জুলাই মাস থেকে করোনা রোগীদের জন্য নির্ধারিত শয্যার বেশির ভাগই খালি থেকেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত করোনা রোগীদের জন্য ১১ হাজার ৬০৫টি শয্যা নির্ধারিত ছিল। এর মধ্যে ভর্তি ছিলেন ২ হাজার ৬৩৯ জন। আর ৮ হাজার ৯৬৬টি শয্যা খালি ছিল। অর্থাৎ কোভিড-১৯ চিকিৎসায় নির্ধারিত সাধারণ শয্যার ৭২ শতাংশই খালি ছিল। ২৭ সেপ্টেম্বর সারা দেশে করোনার চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত মোট ৫৪২টি আইসিইউর মধ্যে ২৮৭ টিতে রোগী ভর্তি ছিল। খালি ছিল ২৫৫টি, যা মোট আইসিইউর ৪৭ শতাংশ।

হাসাপাতাল নিয়ে জনগণের মাঝে এমন ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, হাসপাতালে গেলেই করোনা রোগী মারা যায়। এর থেকে বাড়িতে থাকলেই অন্তত রোগীর প্রয়োজনীয় সেবা করা যায়। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের প্রায় ৭৯ শতাংশ বাড়ি থেকে টেলিফোনে চিকিৎসা নিয়েছে, তারা ওষুধ, খাবার ও পরিচর্যার বিষয়গুলো জেনে নিচ্ছেন। অবস্থা জটিল হলে কোন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া যায়, তা-ও জেনে নিয়েছে রোগী বা তাঁদের স্বজনেরা। টেলিমিডিসিন সেবা প্রদানকারী সংস্থা ও

ব্যক্তিরা জানিয়েছেন মার্চ ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০- পর্যন্ত দেশে করোনায় আক্রান্ত হওয়া রোগীদের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন ১৭ দশমিক ৬৪ শতাংশ। বাকিরা বাসায় থেকেই চিকিৎসা নিয়েছেন। বাংলাদেশের করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

সাধারণ রোগীরা সেবা থেকে বঞ্চিত:

কোভিড-১৯ ছাড়াও যে অন্যান্য রোগব্যাধিতে অনেক মানুষ ভুগছে, তাদেরও যে চিকিৎসার প্রয়োজন সে বিষয়ে দৃশ্যমান কোন উদ্যোগ ছিল না। হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, কিডনি ও লিভারের অসুখ, ক্যানসারসহ নানা ব্যাধিতে ভুগছে যেসব মানুষ তারা চিকিৎসা, ওষুধ না পেয়ে কঠিন সমস্যায় পড়েছিলেন। বয়স্ক মানুষ, গর্ভবতী নারী ও শিশুদের আকস্মিকভাবে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে বড় রকমের অনিশ্চয়তায় পড়তে হয়েছিল। অর্থাৎ, দেশের চিকিৎসাব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবে কাজ করেনি, একরকম অচল হয়ে পড়েছিল।

রাজধানীর বাইরে ২১টি সরকারি হাসপাতালে সাধারণ চিকিৎসাসেবা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছিল করোনা সংক্রমণের শুরুর মাসে। রাজধানীর সরকারি- বেসরকারি হাসপাতালগুলোতেও চিকিৎসা সেবা স্বাভাবিক ছিল না । এর প্রধান কারণ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার ঘটনা বেড়ে গেছিল। অনেক চিকিৎসককে হোম কোয়ারেন্টিন ও আইসোলেশনে থাকতে হয়েছে। এমনিতেই দেশে রোগীর তুলনায় চিকিৎসক কম। এ রকম সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, এমন আশঙ্কা চিকিৎসক মহলে আগেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তারা শুরু থেকেই বলে আসছিলেন, চিকিৎসক ও নার্সদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত না করা হলে তাঁদের অনেকে সংক্রমিত হতে পারেন, অনেককে আইসোলেশনে চলে যেতে হতে পারে। এমন হলে চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিরাট ঘাটতি দেখা দেবে। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিতে ঘাটতি থেকে গেছে।

চিকিৎসকদের নিরাপত্তা:

করোনার সম্মুখ সারির যোদ্ধা চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিয়ে যেখানে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন সেখানে অনেক ক্ষেত্রে ন্যূনতম ব্যবস্থাও ছিল না। বিশ্বজুড়ে এন ৯৫ মাস্ককে সবচেয়ে মানসম্পন্ন সুরক্ষাসামগ্রী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। চিকিৎসকদেরও এই মাস্ক ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু তাদের এন-৯৫ মাস্ক এর বদলে সাধারণ মানের মাস্ক সরবরাহের অভিযোগ উঠে। যুক্তরাষ্ট্রের রোগনিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংস্থা সিডিসি'র তথ্য অনুযায়ী, এন-৯৫ মাস্ক বাতাসে ভাসমান সুক্ষ্ম কণা আটকে দেয়। এটি খুবই সূক্ষ্ম কণা কমপক্ষে ৯৫ শতাংশ ফিল্টার করতে পারে। এটি ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসও ফিল্টার করতে সক্ষম। কিন্তু ১ এপ্রিল, ২০২০- কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে সরবরাহ করা মাস্কের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মুগদা জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক। পরদিন কেন্দ্রীয় ঔষধাগারের পরিচালক সব মাস্ক ফেরত নেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করলেও পরবর্তীতে নেয়া হয়নি।

অন্যদিকে রাজধানীর ছয়টি হাসপাতলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সেবা দেয়া চিকিৎসক, নার্সসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ১৯টি আবাসিক হোটেল বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ২০২০- এর সেপ্টেম্বর মাসে তাদের সেই সুবিধা কোন আলোচনা ছাড়াই প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এর জের ধরে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকদের একটি অংশ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকের কার্যালয় ঘেরাও করে নিরাপদ থাকার জায়গার দাবিতে। বেসরকারি হাসপাতালগুলো করোনার শুরুতেই তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। এই সুযোগে ঢাকার ১০টি বড় ও মাঝারি বেসরকারি হাসপাতালের কয়েকজন চিকিৎসক ও নার্সকে কাজে ইস্তফা, বিনা বেতনে ছুটিতে যেতে বাধ্য করার মতো ঘটনা ঘটেছে।

করোনা ব্যবস্থাপনায় দূর্নীতি:

রাজধানীর মুগদা জেনারেল হাসপাতালে 'এন-৯৫ মাস্কের নামে যেসব মাস্ক দেওয়া হয়েছে, সেগুলো নিয়ে প্রশ্ন তোলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। মুগদা হাসপাতালে ৩০০ মাস্ক দেওয়া হয় যেগুলোর মোড়কে 'এন-৯৫ ফেস মাস্ক' লেখা ছিল। এগুলোর মান দেখে চিকিৎসকদের সংশয় তৈরি হয়। মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ার একটি প্রতিষ্ঠান এই মাস্কের প্রস্তুতকারী। কিন্তু এ নিয়ে হাসপাতাল

ঝুঁকির মুখে চিকিৎসক পেশাজীবীরা

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ২০২০ এর ১৫ এপ্রিল দেশে প্রথম কোন চিকিৎসকের মৃত্যু হয়। এরপর থেকে পাঁচ মাসে করোনায় সংক্রমিত হয়ে এবং উপসর্গ নিয়ে ৮৮ চিকিৎসকের মৃত্যু হয়ছে। এর মধ্যে শুধু ২০২০ এর জুনেই মারা গেছেন ৪৪ চিকিৎসক। বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোশিয়েশনের (বিএমএ) তথ্যানুযায়ী, ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সারা দেশে ৮ হাজার ১৪৯ জন চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং মারা গেছেন ১২০ জন। এ ছাড়া ১ হাজার ৯৭৯ জন নার্স এবং ৩ হাজার ২৮৫ জন অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন বলে জানিয়েছে বিএমএ। চিকিৎসকদের মধ্যে ১৫ এপ্রিল ২০২০ সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক ড. মইনউদ্দিন প্রথম মারা যান । শুরুর দিকে তিনি বাসায় চিকিৎসা নিলেও শ্বাসকষ্ট শুরু হলে হাসপাতালে ভর্তি হন। অবস্থা গুরুতর হলে তাকে ঢাকায় আনা হয়।

করোনা মোকাবিলায় সবার অগ্রভাগে স্বাস্থ্যকর্মীরা। চিকিৎসক, নার্স, ল্যাব টেকনোলজিস্ট, মেডিকেল স্টাফরা কাজ করছেন সম্মুখসারির যোদ্ধা হয়ে। এতে আক্রান্ত হচ্ছেন, মারাও যাচ্ছেন তারা। সারা বিশ্বে ৭ হাজারের বেশি স্বাস্থ্যকর্মী মারা গেছেন করোনা আক্রান্ত হয়ে। দেশে করোনা সংক্রমণের পর মারা গেছেন ১২০ জন চিকিৎসক, যার অর্ধেকের বেশি জুনে। আর নার্স মারা গেছেন ১২ জন। আক্রান্তের ৮০ শতাংশই শুরুর দিকে। অন্য দেশের তুলনায় শুরুর দিকে আক্রান্তের হার বেশি ছিল। তবে বাংলাদেশ ডক্টরস ফোরামের (বিডিএফ)-এর তথ্যমতে সব মিলে স্বাস্থ্যকর্মী মারা গেছেন ১৩০ জন।

চিকিৎসক, নার্স ও টেকনোলজিস্টরা বলছেন, সংক্রমণের শুরুর দিকে সুরক্ষা সামগ্রীর অপ্রতুলতা, অব্যবস্থাপনা, সচেতনতার অভাবে স্বাস্থ্যকর্মীরা বেশি হারে আক্রান্ত হয়েছেন। সেসব সমস্যা কমে অসায় এখন আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার কমে এসেছে। বেসরকারি সব হাসপাতালের হিসাব ঠিকমতো পাওয়া যায় না। করোনা রোগীদের কাছাকাছি থেকে সেবা দিচ্ছেন নার্স ও ল্যাব টেকনোলজিস্টরা। তাদের আক্রান্তের হার বেশি। বিশেষ করে নমুনা সংগ্রহ ও নমুনা পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত থাকা ল্যাব টেকনোলজিষ্টরা বেশি আক্রান্ত হয়েছেন। তবে তাদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা তুলনামূলক কম। করোনার উপসর্গ নিয়ে চারজনের মৃত্যু হলেও আক্রান্ত হয়ে ল্যাব টেকনোলজিস্ট মৃত্যুর কোনো তথ্য নেই। আক্রান্ত হয়েছেন দেড় হাজারের বেশি।

সারা দেশে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৯০৯ জন পুলিশ সদস্য করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সদস্যই ২ হাজার ৮৫৮ জন। এ পর্যন্ত ১৫ হাজার ৫১৩ জন পুলিশ সদস্য সুস্থ হয়েছেন। ২০২০ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৭৩ জন পুলিশ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে।

পরিচালকের ঔষধ প্রশাসনকে চিঠির প্রেক্ষিতে কোন কার্যকর ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো হাসপাতালের পরিচালককে ওএসডি করা হয়। যদিও ব্যাপক সমালোচনার প্রেক্ষিতে রাজধানীর মুগদা জেনারেল হাসপাতালসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় এন-৯৫ মাস্কের নামে যেসব দেশীয় মাস্ক দেয়া হয়েছিল, সেগুলো প্রত্যাহার করে নেয় কেন্দ্রীয় ঔষধাগার (সিএমএসডি)। এন-৯৫ মাস্কের নামে নিম্নমানের সাধারণ মাস্ক সরবরাহের ঘটনাকে পরিকল্পিত প্রতারণা ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গঠন করা তদন্ত কমিটি। কেন্দ্রীয় ঔষধাগারের কমিটির এই প্রতিবেদনের আলোকে মাস্ক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান জেএমআই এবং মালামাল গ্রহণ, বিতরণ বা অন্য যেকোনোভাবে এ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করে মন্ত্রণালয়।

কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়, কেন্দ্রীয় ঔষধাগারের অনুরোধে জেএমআই দুই চালানে ২০ হাজার ৬০০টি এন-৯৫ নামের ফেস মাস্ক সরবরাহ করে। তদন্তে দেখা গেছে, সরবরাহ করা পণ্যের মান ঠিক হয়নি, তাদের পণ্য তৈরির অনুমোদন প্রক্রিয়াও শুরু হয়নি, পণ্য তৈরির জন্য বৈধভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয়নি। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ভাষ্য অনুযায়ী পণ্যটি (কথিত এন-৯৫ মাস্ক) গবেষণা ও উন্নয়ন পর্যায়ে রয়েছে। এন-৯৫ মাস্কের বৈধ উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক না হয়েও সুদৃশ্য মোড়কে ৯৯ দশমিক ৯ শতাংশ

সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিয়ে এসব মাস্ক সরবরাহ করা হয়েছে। এটিকে কোনোভাবেই ভুল হিসেবে বিবেচনার সুযোগ নেই। মাস্কগুলো ব্যবহৃত হলে কোভিড-১৯ সংক্রমণকালে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের বড় ধরণের বিপর্যয় ঘটার আশঙ্কা ছিল। ঘটনাটি একটি পরিকল্পিত প্রতারণা এবং শাস্তিযাগ্য অপরাধ বলে প্রতীয়মান হয়। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের মিল না থাকার বিষয়টি জেনেও তা গ্রহণ এবং বিতরণ করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন।

চীন থেকে চোরাই পথে নিম্নমানের কেএন-৯৫ মাস্ক এনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একটি প্রকল্প থেকে প্রায় সাড়ে আট কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় সিম কর্পোরেশন নামের একটি প্রতিষ্ঠান। কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড প্যান্ডেমিক প্রিপায়ার্ডনেস (ইআরপিপি) নামের ওই প্রকল্পে সিম করপোরেশন কেএন-৯৫ মাস্ক, ইনফ্রারেড থার্মোমিটার ও নন-কন্ট্রাক্ট ইনফ্রারেড থার্মোমিটার সরবরাহ করে। এতে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম ও সরকারি অর্থ তছরূপ হয়েছে। সিম করপোরেশনের সঙ্গে তৎকালীন প্রকল্প পরিচালক ২০২০ এর ১৮ এপ্রিল ২ লাখ ১০ হাজার কে-৯৫ মাস্ক এবং ১ হাজার ৫৫০ ইনফ্রারেড থার্মোমিটার সরবরাহের জন্য ৯ কোটি ২০ লাখ ৬০ হাজার টাকার চুক্তি সই করেন। এই মূল্য প্রচলিত বাজারমূল্যের অনেক বেশি।

করোনা নিয়ে মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের কাজে সমন্বয়হীনতা আগে থেকে থাকলেও সেটা প্রকাশ্যে আসে কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল হিসেবে অধিদফতর থেকে অনুমোদন পাওয়া রিজেন্ট হাসপাতাল এবং নমুনা সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান জেকেজির নজিরবিহীন দুর্নীতি, অনিয়ম ও প্রতারণার পর। আলোচনা সমালোচনার পর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলা হয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে চুক্তিটি করা হয়েছিল। এর আগে জেকেজি নামের একটি প্রতিষ্ঠানের ভুয়া নমুনা পরীক্ষার ঘটনা সামনে আনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সেই ঘটনা মানুষের মন থেকে মুছে যাওয়ার আগেই

রিজেন্ট হাসপাতালের প্রতারণা সারা দেশে সাড়া ফেলে। রিজেন্টের সঙ্গে করা চুক্তিপত্রে সই করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ। মন্ত্রীর ভাষ্যমতে চুক্তিতে অনেক কিছুই লেখা হয়ে থাকে যা কখনো কেউ পড়েনা। অন্যদিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্র জানায়, ল্যাবরেটরি সরেজমিনে না দেখে আরও কিছু প্রতিষ্ঠানকে করোনা পরীক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়। এই ঘটনায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।

টিআইবি'র একটি গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর অনুমোদিত একটি প্রতিষ্ঠান ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা ছাড়াই ১৫ হাজার ৪৬০ জনকে ভুয়া রিপোর্ট দিয়েছে। জরিপে অংশ নেওয়া সেবাগ্রহীতাদের ৯.৯ শতাংশ নমুনা পরীক্ষায় ভুল প্রতিবেদন পেয়েছেন। যথাসময়ে প্রতিবেদন না পাওয়ায় অনেক প্রবাসীর কর্মক্ষেত্রে ফেরায় ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, অনেক কষ্টে জোগাড় করা ফ্লাইট বাতিল হয়ে যায়। এছাড়া কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভুয়া প্রতিবেদন নিয়ে ভ্রমণ করায় ছয়-সাতটি দেশে বাংলাদেশিদের গমনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং যাত্রীদের ফেরত পাঠানো হয়। অনেক দেশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সনদ গ্রহণ করেনি।

শুধু ল্যাবরেটরি বা হাসপাতালের অনুমতির বিষয় নয়, আরও কিছু ঘটনায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জবাবদিহির ঘাটতি দেখা গেছে। বেশ কয়েকটি হাসপাতালে ঘুরে চিকিৎসা না পেয়ে রাজধানীতে একাধিক মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তের ক্ষেত্রে কোন উদ্যোগ নেয়নি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। পাঁচ হাজারের বেশি চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হয়েছেন, অনেকে মারা গেছেন। স্বাস্থ্যকর্মীদের সংক্রমণ ঝুঁকির কারণ অনুসন্ধান এবং করণীয় নির্ধারণের কথা ছিল। সেই কাজ কেন হয়নি, কেউ জানে না। গবেষণা, পরিকল্পনা, নীতি নির্ধারণের জন্য যে মানসম্পন্ন রোগতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্ত পরিসংখ্যান দরকার, তা নেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পাবলিক হেলথ অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্যরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি লিখেও তথ্য পাননি এমন খবর প্রকাশিত হয়েছে গণমাধ্যমে।

স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ ও বাস্তবতা:

বিশ্বে স্বাস্থ্য খাতে সবচেয়ে কম বিনিয়োগের দেশের মধ্যে একটি বাংলাদেশ। এখানে ৬৭% মানুষ নিজের পকেট থেকে চিকিৎসার খরচ বহন করে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা

সুবিধার অভাব, আমদানি করা যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে পড়ে থাকা, কেনাকাটায় দুর্নীতি ইত্যাদি সংবাদপত্রের নিত্যকার খবর। স্বাস্থ্যখাতের জন্য বরাদ্দ থাকে অনেক কম, আবার বরাদ্দের বেশিরভাগই ব্যয় হয় অবকাঠামো নির্মান ও বেতনভাতা বাবদ। বাংলাদেশে সংক্রমণের আগে থেকেই সরকার বলেছিল সকল প্রস্তুতি নেয়া আছে। কিন্তু কিছুদিন পরেই সীমাবদ্ধতা, সমন্বয়হীনতা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। স্বাস্থ্যখাত সরকারের অগ্রাধিকার খাত হলেও বাজেটে তার প্রতিফলন কমই দেখা যায়। গত ১০ বছরে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বেড়েছে কিন্তু জাতীয় বাজেটে এ খাতের অংশ কমেছে। গত দশকে বাজেটে এই খাতের বরাদ্দ ৬ শতাংশের সামান্য বেশি থেকে ৫ শতাংশের নিচে নেমে গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য বলছে, স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু সরকারি ব্যয়ের দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। এটা ৮৮ ডলার মাত্র। ১২৯ ডলার নিয়ে বাংলাদেশের পরেই আছে পাকিস্তান। ভারত খরচ করে ২৬৭ ডলার। মাথাপিছু প্রায় দুই হাজার ডলার খরচ করে তালিকায় সবচেয়ে এগিয়ে আছে মালদ্বীপ। এরপরই আছে শ্রীলঙ্কার খরচ ৩৬৯ ডলার। বিশ্বে মাথাপিছু স্বাস্থ্য বরাদ্দের শীর্ষে আছে যুক্তরাষ্ট্র যেখানে খরচ হয় বাংলাদেশের ১০৭ গুণ বেশি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে বাজেটের ৪ দশমিক ৯ শতাংশ বরাদ্দ হয়েছে। এই অর্থবছরে মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ মিলিয়ে মোট ২৫ হাজার ৭৩৩ কোটি টাকা পেয়েছে। এর মধ্যে ১৩ হাজার ৪৬৬ কোটি টাকা পরিচালন খাতে। মোট স্বাস্থ্য বাজেটের এটা প্রায় ৫৩ শতাংশ। এটার এক-চতুর্থাংশের মতো বরাদ্দ হচ্ছে ওষুধ ও সরঞ্জামাদি কেনার জন্য। বেশিরভাগই যাচ্ছে বেতনভাতায়, যদিও জনসংখ্যার অনুপাতে চিকিৎসক ও নার্স এখনো অত্যন্ত অপ্রতুল।

করোনাকালে দেশের স্বাস্থ্যখাতের বাস্তবিক চিত্র সামনে নিয়ে আসে। স্বাস্থ্যখাতের দুর্বলতা সরকারের করোনা মোকাবেলার আন্তরিক প্রচেষ্টায় মূল প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। অব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব, দূর্নীতিসহ মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ ইত্যাদি ছিল সারা বছরের আলোচিত বিষয় যা করোনা মোকাবেলায় প্রচ্ছন্ন হুমকি হিসেবে কাজ করে। এসব বিষয় করোনার ঝুঁকিকে কয়েকগুন বাড়িয়ে তোলে যার শিকার হয় সম্মুখসারির যোদ্ধা তথা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। আবার বিকল্প ব্যবস্থা না রেখে সবকিছু বন্ধ করে দেয়ায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেনী চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। অথচ শুরু থেকেই সব চ্যালেঞ্জগুলোকে সামনে রেখে একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলে আর্থ-সামজিক সঙ্কট যেমন মোকাবেলা করা সম্ভব হতো, তেমনি করোনা নিয়ে অহেতুক আতঙ্ক ও যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে মানুষের দূর্ভোগ লাঘবও সম্ভবপর হতো।

-

কোভিড-১৯: তথ্যের অবাধ প্রবাহের কণ্ঠরোধ এর প্রভাব

- নাগরিক উদ্যোগ ডেস্ক প্রতিবেদন

২০২০- সালকে ভুলে যেতে চাওয়ার সুযোগ থাকলে পৃথিবীর মানুষ তাই চাইতো। মরণব্যাধি করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯ এর প্রভাবে পৃথিবীর ২০০টি দেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন আজ বিপর্যস্ত। আর এই বিপর্যয়ের শুরুর পেছনে অন্যতম একটি কারণ হলো মত প্রকাশে বাধা বা তথ্যের অবাধ প্রবাহের কণ্ঠরোধ। চীনের হুবেই প্রদেশের রাজধানী উহানের চক্ষু বিশেষজ্ঞ লি ওয়েনলিয়াং যখন একটি অদ্ভুত ধরণের ভয়াবহ ভাইরাসের তথ্য প্রচার করেন তখনই তাকে 'গুজব রটনা'র দায়ে রাষ্ট্রীয় হয়রানির শিকার হতে হয়। থামিয়ে দেয়া হয় এই ভাইরাস সম্পর্কিত সকল ধরণের সংবাদ ও তথ্য বিনিময়। এর পরের ঘটনা আজ ইতিহাসের অংশ। উহানে ৪ হাজারের বেশি মানুষ এই নোবেল করোনা ভাইরাস তথা কোভিড-১৯- এ মারা গেছেন আর মার্চ ২০২১ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ১৭৪ মিলিয়নের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে, মৃত্যুবরণ করেছে ৩.৭ মিলিয়নের বেশি। অথচ সে সময় ডা. লি'র তথ্যকে শুরুতেই গুরুত্ব দিলে অল্পতেই থামানো যেতো এই ভয়াবহ বিপর্যয়।

চীনে ঘরের বিপর্যয় লুকিয়ে রাখার প্রবণতা খুব পুরোনো বিষয়। দেশটিতে সার্স ভাইরাসের সংক্রমণ হয় ২০০২-০৩ সালে। চীনা কর্তৃপক্ষ কয়েক মাস ধরে গোপন রেখেছিল সেই ভয়াবহ তথ্য। প্রকাশ হতে হতে ২৬টি দেশের সাত শতাধিক মানুষ মারা যায়। চীনে আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে। নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিসি) সব সময় জনগণকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করে যে সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে। এর অর্থ হচ্ছে যেসব বিষয়ে সাড়া দেয়া প্রয়োজন, তা না করে সিপিসি'র নেতৃত্বের প্রতি খারাপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে এমন কেলেঙ্কারি এবং ঘাটতিগুলো পদ্ধতিগতভাবে গোপন করা।

করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত প্রথম খবরটি উহানে গত ৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত হওয়ার বেশ কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত উহান পৌর স্বাস্থ্য কমিশন কোনো নির্দেশনা জারি করেনি এবং তারপর থেকে উহান শহরের কর্মকর্তারা এই রোগের ভয়াবহতাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে ইচ্ছাকৃতভাবে এ-সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশকে দমন করার চেষ্টা করেছেন। সরকার নাটকীয়ভাবে ইন্টারনেট, মিডিয়া এবং নাগরিক সমাজের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে এবং এই রোগ সম্পর্কে 'গুজব' ছড়ানোর জন্য পুলিশ জনগণকে হয়রানি করে। একটি সমীক্ষা অনুসারে, চীনের জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম উইচ্যাটে ২০১৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর থেকে ২০২০ সালের ৪ জানুয়ারির মধ্যে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের উল্লেখ ছিল। পৌর স্বাস্থ্য কমিশন পরে যে নোটিশ জারি করে তাতে বলা হয়, নতুন ভাইরাস মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে-এমন কোনো

প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং দাবি করা হয় যে কোনো স্বাস্থ্যকর্মী এ ভাইরাসে আক্রান্ত হননি। পৌর স্বাস্থ্য কমিশন ৫ জানুয়ারি ২০২০ যখন এই দাবি করে, ততদিনে ৫৯ জন মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এমনকি ১১ জানুয়ারি ২০২০ এই ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম ব্যক্তির মৃত্যুর পরও কমিশন জোর দিয়ে বলেছিল যে এটি মানুষের মধ্যে সংক্রমণ হতে পারে বা স্বাস্থ্যকর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন এমন কোনো প্রমাণ নেই।

২০১৯ এর ৩০ ডিসেম্বর চিকিৎসকদের একটি চ্যাটগ্রুপে বার্তা দিয়ে করোনাভাইরাস নিয়ে সহকর্মীদের সতর্ক করেছিলেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ লি ওয়েনলিয়াং। চোখের চিকিৎসক হলেও তিনি কয়েকজন রোগীর মধ্যে বিশেষ ধরণের ভাইরাসের সংক্রমণ লক্ষ্য করেন। উহানের হাসপাতালে এ ধরণের রোগীদের সংখ্যা তখন বাড়তে শুরু করেছে। লি দেখছিলেন, চীনের সরকার এ নিয়ে তেমন কোনো তথ্য প্রকাশ করতে চাইছে না। চিকিৎসকের দায়বদ্ধতা থেকে লি তাঁর কর্তব্য ঠিক করে ফেলেন। ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে তিনি তাঁর সহকর্মী চিকিৎসকদের সুরক্ষামূলক পোশাক পরার পরামর্শ দেন। সে সময় করোনা সংক্রমণ রোধে চীনের সরকারের তৎপর হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে ঘটল উল্টোটা। চার দিন পর লিকে তলব করে জননিরাপত্তা ব্যুরো। সামাজিক অস্থিরতা ছড়ানোর জন্য লিখিত বিবৃতি দিয়ে ক্ষমা চাইতে হয় লিকে। চুপ থাকতে বাধ্য হন লি। এর মধ্যে আরও ছড়িয়ে পড়ে করোনাভাইরাস। গত ১০ জানুয়ারি ২০২০ লিও আক্রান্ত হন। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তিনি মারা যান। মৃত্যুর কারণ নিয়ে লুকোচুরির পর জানা যায়, লি'র মৃত্যু হয়েছে করোনাভাইরাসে। ডা. লি'র করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর পর চীন জুড়ে জনগণ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ শুরু করে। সামাজিক গণমাধ্যমে 'আমরা বাক স্বাধীনতা চাই' শীর্ষক পোস্ট দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যদিও কয়েক ঘন্টার মধ্যে এ ধরণের পোস্ট সরকার মুছে দিতে সক্ষম হয়।

শুধু ডা. লি নয়, অন্যান্য যারা এই ভাইরাস নিয়ে অনুসন্ধানমূলক তথ্য প্রচার করেছেন সবাইকেই রাষ্ট্রীয় বাহিনীর রোষানলে পড়তে হয়। সাংবাদিক চেন কিউশি চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দা। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার কেন্দ্রস্থল উহান থেকে তিনি সমালোচনামূলক প্রতিবেদন করছিলেন। করোনাভাইরাস ঠেকাতে উহানে যাতায়াতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে চীনা সরকার। এর এক দিন পর ২৪ জানুয়ারি ২০২০ চেন কিউশি সেখানে যান। তিনি সেখানকার ভিড়ে ঠাসা হাসপাতাল, মৃতদেহের সৎকারকারী প্রতিষ্ঠান, অস্থায়ীভাবে তৈরি বিচ্ছিন্ন করে রাখা ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। নিজের চোখে দেখা এসব জায়গার ভিডিও তিনি অনলাইনে আপলোড করেন এবং উহানের বিপর্যস্ত অবস্থা সম্পর্কে বিশ্বের মানুষ জানতে পারে। লির মতো চুপ করানো হয় চেনকেও। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকে তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইউটিউবে লাইভে এসে চেনের মা অভিযোগ করেন, তাঁর ছেলেকে জোর করে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। চীনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চেনের আপলোড করা সবকিছু মুছে ফেলা হয়েছে। করোনাভাইরাসের খবর শেয়ার করায় চীনে বার্তা আদান-প্রদানের মেসেজিং অ্যাপ 'উইচ্যাটে' অনেককে ব্লক করে দেওয়া হয়েছে।

১১ জানুয়ারি ২০২০- প্রথম মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হলে নতুন করোনাভাইরাস সম্পর্কে আলোচনা সামান্য বাড়ে। তবে আবার তা দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়। পরে ২০ জানুয়ারি ২০২০- এর পর যখন উহান, বেইজিং ও গুয়াংদংয়ে ১৩৬ জনের আক্রান্ত হওয়ার খবর প্রকাশ পেল, তখন সরকার সেন্সরশিপের প্রচেষ্টা থেকে সরে আসে। ওই সময়টায় উহান পৌর স্বাস্থ্য কমিশন প্রথমবারের মতো এই প্রাদুর্ভাবকে স্বীকার করে নিয়েছিল। তবে পরে তারা এ নিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। চীনা কর্তৃপক্ষ তখন থেকে তার কৌশলে পরিবর্তন করে এই রোগটিকে তারা কতটা গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করছে তা দেখানোর কৌশল গ্রহণ করে।

ড. লি'র মৃত্যু ও করোনা ভাইরাসের ব্যাপক বিস্তারের সময় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অনেকটা কোনঠাসা হয়ে যাওয়ায় সিটিজেন জার্নালিজম গতিশীল হয়। গণমাধ্যমের কিছু অংশ করোনার প্রাদুর্ভাব নিয়ে তদন্তমূলক প্রতিবেদনের পাশপাশি ব্যক্তিগত পর্যায়ে উহানের ভাইরাস এবং পরিস্থিতি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে অনেক তথ্য প্রকাশিত হতে শুরু করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ সমালোচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। করোনা বিষয়ক যে কোন তথ্য সামাজিক মাধ্যমে ফ্লাডিং করাকে আইনের আওতায় আনার পরোক্ষ হুমকির প্রেক্ষিতে জনসাধারণ নিজেদেরকে আবারো গুটিয়ে নিতে শুরু করে। করোনাভাইরাস দক্ষতার সাথে মোকা বেলা চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির অলৌকিক সাফল্য- এ জাতীয় ইতিবাচক পোস্ট দিতে জনাসাধারণকে উৎসাহিত করতে দেখা যায়। যদিও চীন সরকার ডা. লি'র মৃত্যুর জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে দোষারোপ করে কিন্তু লি'র কণ্ঠরোধ কেন্দ্রীয় সরকারের অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ কৌশলেরই অংশ। ডিসেম্বরের শেষ থেকে করোনার সংক্রমণের শুরুতেই লির সতর্কবার্তা চীনা সরকারকে যদি আরেকটু ভাবাত, তাহলে প্রতিরোধব্যবস্থা সংক্রমণের শুরুতেই নেওয়া যেত। আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যাটা আরও কম হতে পারত। ভ্যাকসিন তৈরির উদ্যোগটাও শুরু হতো আরও আগে। তথ্যকে চেপে রাখার এই প্রবণতা মহামারিগুলোতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অন্ধাকারেই রেখে দেয় এবং তারা সময়মতো যথাযথ ব্যবস্থা নিতে তাদের সামর্থ্যকে কাজে লাগাতে পারে না। স্বাস্থ্যমন্ত্রীসহ চীনা কর্মকর্তারা জনগণের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য গোপন না রাখলে ২০০২-০৩ সালের সার্স মহামারির বিস্তারও খুব দ্রুতই রোধ করা যেত। তবু চীন ওই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়নি বলে মনে হচ্ছে। তবে যা স্পষ্ট তা হলো, চীনের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে এখন হাজার হাজার মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত। হাজার হাজার লোকা মারা যাচ্ছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ, বাক-স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকাই করোনার মতো মহামারি ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান কারণসমূহ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

-

করোনা মহামারিকালে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট

- মনোয়ার মুস্তফা

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি:

বাংলাদেশে "সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি" বা Social Safety Net Program নামে একাধিক ছোট-বড় প্রকল্প ও কর্মসূচি চালু রয়েছে। ২৩টিরও বেশি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এগুলি বাস্তবায়ন করছে। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এ ধরণের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। আসলে মূল বাজেট কাঠামো বা দলিলে "সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি" নামে বিশেষ কোন খাত নেই। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ দারিদ্র্য ও পিঁছিয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে টার্গেট করে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বৈষম্য হ্রাসের উদ্দেশ্যে যে সব কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সেগুলির সমষ্টিকেই "সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি" নাম দেয়া হয়েছে। এটি মূল বাজেট দলিলের অংশ নয়; এমনকি বাজেট সংক্রান্ত যে সব দলিলপত্র প্রকাশ হয়, সেখানে এটি পাওয়া যায় না। মূলত: অর্থ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এইসব প্রকল্প ও কর্মসূচির একটি তালিকা (বাংলা ও ইংরেজিতে) প্রস্তুত করে তাদের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। এই প্রকল্প ও কর্মসূচিগুলির তালিকা বাস্তবায়নকারী স্ব স্ব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বাজেট দলিল ও ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায়।

সরকারি দলিলপত্রে বলা হয়ে থাকে যে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বৈষম্য হ্রাস। নীতি নির্ধারকরাও তাদের বক্তব্যে সব সময় এই কথাটিই উল্লেখ করে থাকেন। তবে বিগত দু'দশক ধরে এই কর্মসূচিগুলির চরিত্র ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তর সমালোচনাও হয়েছে। যদিও বলা হয়ে থাকে যে, এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বৈষম্য নিরসনে ইতিবাচক ফল বয়ে এনেছে, তবে উপকারভোগী নির্বাচনে ত্রুটি, অব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্পর্কিত একাধিক "ইস্যু" ও "চ্যালেঞ্জ" চিহ্নিত করে কর্মসূচিগুলিকে আরো সুসংহত ও কার্যকর করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। মূলত একটি কমপ্রিহেনিসিভ সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার নিরিখে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষভাগে ২০১৫ সালে National Social Security Strategy (NSSS) তৈরি করা হয়। এই নীতিপত্রের আলোকে ৫ বছর মেয়াদি (২০১৬-২১) একটি কর্মপরিকল্পনাও চূড়ান্ত করা হয়েছে। কিন্তু চলমান "সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী" কর্মসূচিতে এর কোন ছাপ পরিলক্ষিত হয় না।

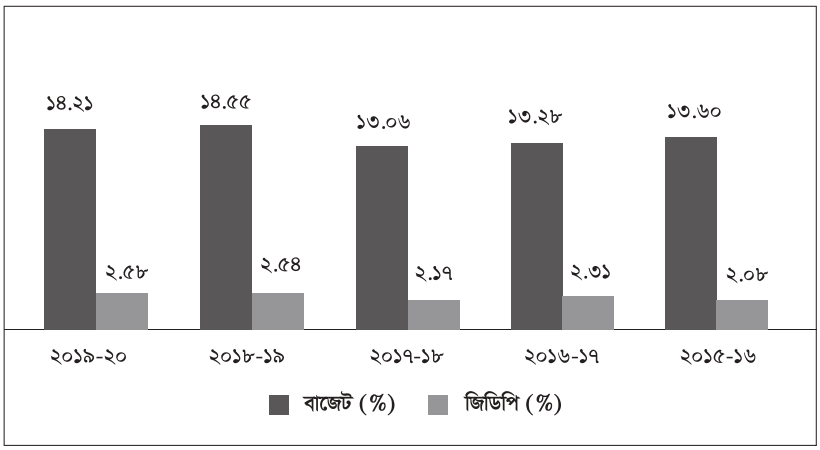

লেখচিত্র ১: সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে বাজেট বরাদ্দের ধারা (২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০)

বাজেট বরাদ্দের ধারা:

চলতি অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী'র অধীনে এ ধরণের প্রকল্প ও কর্মসূচির সংখ্যা মোট ১৩২টি। মোট বরাদ্দ ৭৪, ৩৬৭ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১৪.২১ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২.৫৮ শতাংশ। বিভিন্ন অর্থবছরের বাজেটে প্রকল্প সংখ্যারও হেরফের ঘটে।

সরকারি দলিলপত্রে অবশ্য একথা স্বীকার করা হয় যে, দেশীয় বাস্তবতা ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের বিবেচনায় সামাজিক নিরাপত্তা খাতে আমাদের বাজেট বরাদ্দ অপ্রতুল। বরাদ্দের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে প্রতিবছর এই খাতে বরাদ্দ ধীর গতিতে হলেও বাড়ছে। কিন্তু বিদ্যমান নিরপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে ৪টি বিশেষ কর্মসূচি নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলে থাকেন। বিশেষ করে ১."সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসর ও পারিবারিক অবসর ভাতা", ২. "মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা", ৩. "যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতা" ও ৪. "শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রেশন"- এই চারটি কর্মসূচিকে কী যুক্তিতে নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা হয়েছে- তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পেনশনতো তাদের "প্রাপ্য"র অংশ হিসেবে বিবেচ্য। আর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য "সম্মানী" কিংবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কি দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রণীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অংশ নাকি মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের অবদানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন? লক্ষণীয় বিষয় হলো- এই ৪টি কর্মসূচিই গোটা নিরাপত্তা কর্মসূচির ৩৫-৪০ শতাংশ। এগুলির বিশেষ চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের আলাদা ধরণের কারণে এগুলিকে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বাইরে রাখলে টাকার অঙ্কের হিসেবে "প্রকৃত" নিরাপত্তা বেষ্টনীর আকার অনেক ছোট হয়ে যায়।

কর্মসূচির ধরণ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় কর্মসূচিগুলিকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়। দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বৈষম্য নিরসনের বিবেচনায়- দু'টি ক্যাটেগরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ: ১. বিভিন্ন ধরণের নগদ সহায়তা (ভাতা, উপবৃত্তি ইত্যাদি) ও ২. খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত কর্মসূচিসমূহ।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নগদ সহায়তা সম্পর্কিত মোট ১৯টি কর্মসূচির মধ্যে ওপরে উল্লেখিত ৪টি বিশেষ কর্মসূচিও যুক্ত হয়ে আছে। সেগুলিকে হিসাবের বাইরে রাখলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে নগদ সহায়তার শতকরা হার নেমে আসে মাত্র ৯.৭৮ শতাংশে। এই ৯.৭৮ শতাংশ অর্থাৎ ৭,২৭২.৭৪ কোটি টাকা নগদ সহায়তা হিসেবে সাধারণ দরিদ্র পরিবারগুরিকে দেয়া হয়।

এ ছাড়াও বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আরো এমন সব ছোট ছোট প্রকল্প ও কর্মসূচিকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়, যে গুলির সাথে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বৈষম্য নিরসনের সরাসরি কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়। ফলে গোটা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিকে নতুন করে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

করোনা মহামারিকালে "সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী" কর্মসূচি

করোনা মহামারির প্রেক্ষিতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নিয়ে নতুন করে ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দরিদ্র মানুষ, বয়স্ক, নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীসহ সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিপুল অংশ নানাভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ওপর নির্ভরশীল। বর্তমান পরিস্থিতিতে ঘরবন্দী এসব মানুষের জীবন-জীবিকা থমকে গেছে।

সরকারি হিসেবে বাংলাদেশে প্রায় ৩ কোটি ৩০ লাখ দরিদ্র মানুষ আছে। গড়ে ৫ সদস্যের পরিবার হিসাব করলে কাগজে-কলমে মোট ৬৬ লক্ষ দরিদ্র পরিবার রয়েছে। কিন্তু বিগত আড়াই মাসে আরো কতো পরিবার দারিদ্র্য সীমার নীচে নেমে গেছে সে সংক্রান্ত কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য আমাদের হাতে নেই। নিম্ন

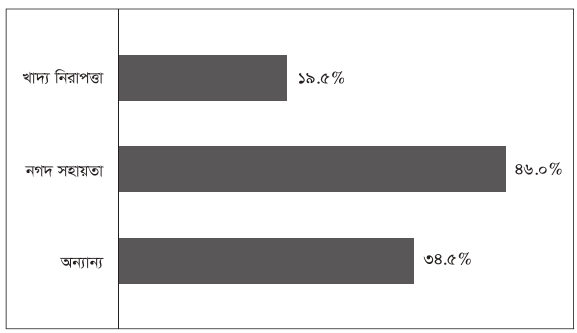

লেখচিত্র ২: কর্মসূচির ধরণ ও সামাজিক নিরাপত্তায় মোট বরাদ্দের শতকরা হার (২০১৯-২০)

মধ্যবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত বহু দারিদ্র্য সীমার পরিবারও হয়তো দারিদ্র্য সীমার নীচে নেমে গেছে অথবা দারিদ্র্য রেখার কাছাকাছি অবস্থান করছে। কারণ গত আড়াই মাসে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত বহু মানুষ তাদের চাকরি বা কাজ হারিয়েছে। চাকরি ও কাজের বাইরে অনেক পরিবারের অন্যান্য নানান উৎস থেকে স্বাভাবিক আয়ের পথও বন্ধ হয়ে গেছে। সাধারণ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এরকম ধারণা করা অমূলক নয় যে, দেড় কোটির কাছাকাছি পরিবার অর্থাৎ প্রায় ৫ কোটি মানুষ এখন দরিদ্র হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বিপদাপন্ন সম্ভবত ৭৫ লক্ষ পরিবার যারা হতদরিদ্রের খাতায় নাম লিখিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারগুলির চেয়ে শহরে পরিবারগুলি সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করছে। গ্রামে কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করার সামান্য সুযোগ থাকলেও শহরে কাজের সুযোগ একেবারে নেই বললেই চলে। তাছাড়া এমনিতেই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুযোগ-সুবিধা শহরের চেয়ে গ্রামেরই বেশি সম্প্রসারিত। অর্থনীতির চাকা কবে নাগাদ চালু হতে পারে তা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে।

ফলে এবারের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে সাজাতে হবে এই ১.৫ কোটি দরিদ্র পরিবারের সংকটকে মাথায় রেখে। আমাদের মনে রাখা দরকার, এসব পরিবারের আপাত: সস্তা শ্রমই আমাদের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে। এর মধ্যেই রয়েছে দরিদ্র্য কৃষিভিত্তিক পরিবার ও শহুরে তৈরি পোষাক খাত, নির্মাণ শ্রমিকসহ স্বল্প আয়ের নানা শহুরে পেশার শ্রমিক পরিবার।

এই প্রেক্ষাপটে, এবারের বাজেটে "সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী" খাতটি গুরুত্ব ও অর্থ বরাদ্দের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দাবি করছে। বিশেষ করে মহামারিকালীন সময়ে এবং আগামী অর্থবছর জুড়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর দু'টি ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে: ১. নগদ সহায়তা কর্মসূচি ও ২. খাদ্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি। সামাজিক সুরক্ষা খাতকে আরো যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট আরো কয়েকটি বিষয়ে পরিবর্তন আনতে হবে।

দরিদ্র সাধারণের অন্তর্ভূক্তিতে করণীয়:

- করোনা মহামারিকালীন এই দুর্যোগে ১.৫ কোটি দরিদ্র্য পরিবারের জন্য "বিশেষ নগদ সহায়তা" কর্মসূচি নামে একটি আপদকালীন কর্মসূচি চালু করতে হবে। আগামী ৬ মাস প্রতিটি পরিবারকে মাসে কমপক্ষে ৫,০০০ টাকা নগদ সহায়তা দিতে হবে। এজন্য মোট খরচ হবে ৪৫ হাজার কোটি টাকা। আমরা এই কর্মসূচির জন্য ৫০ হাজার কোটি টাকার একটি বিশেষ তহবিল গঠনের প্রস্তাব করছি। কোন ধরণের মধ্য-ব্যবস্থা ব্যতিরেকে মোবাইলের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারকে এই টাকা পৌঁছে দিতে হবে। এ জন্য বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বহু এডহক প্রকল্প/কর্মসূচি আপাতত: স্থগিত রেখে সেই অর্থ প্রস্তাবিত তহবিলে হস্তান্তরের প্রস্তাব রাখছি।

- বিদ্যমান নানা ধরণের নগদ সহায়তা (উপবৃত্তিসহ বিভিন্ন ধরণের ভাতা) কর্মসূচিগুলিকে চালু রাখার পাশাপাশি ভাতার পরিমাণ ও উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়াতে হবে।

- ছোট-বড় সব শহরেই নগদ সহায়তা ও খাদ্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির আওতা বাড়াতে হবে। নগর দারিদ্র্যকে কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

- চলতি অর্থবছর থেকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি ও প্রকল্পের তালিকা থেকে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পেনশনসহ মুক্তিযোদ্ধাদের "সম্মানী" সংক্রান্ত মোট ৪টি কর্মসূচি অন্যত্র আলাদাভাবে প্রদর্শনের প্রস্তাব করছি। এই ৪টি কর্মসূচির বাইরে যেগুলো থাকবে সেটিই মূলত: "সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী" খাতে বরাদ্দ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই বিবেচনায় চলতি অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে মোট বরাদ্দ ৪৭,৪৪০.৮ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৯.০৬% এবং জিডিপি'র ১.৬%।

- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো নির্ভরযোগ্য তথ্যভান্ডারের অনুপস্থিতি। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজে লাগিয়ে এ ধরণের একটি তথ্যভান্ডার গড়ে তুলতে হবে।

- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ; জেলা উপজেলার সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলি শুধুমাত্র তদারকি ও পরিবীক্ষণের কাজ করবে।

- প্রতিটি স্থানীয় সরকারকে তাদের স্ব স্ব এলাকার জন্য একটি চাহিদাভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা সেবার পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। এটাই হবে " বেইজলাইন"। প্রতি বছর এই বেইজলাইন আপ-ডেট করতে হবে। বেইজলাইনের ভিত্তিতে সেবার চাহিদা ও যোগানের নিরিখে উপকারভোগী নির্বাচন করতে হবে।

- National Social Security Strategy ও এ সম্পর্কিত ইতিমধ্যে গৃহিত 'এ্যাকশন প্ল্যান' অনুসরণ করে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বিদ্যমান কাঠামো বদল করতে হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো: ১. বিদ্যমান কর্মসূচির সংখ্যা কমিয়ে অনেক প্রকল্প ও কর্মসূচিকে একত্রিত করে স্বল্প সংখ্যক কর্মসূচিতে রূপ দিতে হবে, ২. বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে, ৩. নির্ভরযোগ্য তথ্য ভান্ডার তৈরি করে উপকারভোগী নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও দুর্নীতি কমিয়ে আনতে হবে।

- সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। ১. সার্বজনীন অবসর ভাতা (Universal Pension Scheme) ও সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (Universal Healthcare System)।

- মনোয়ার মুস্তফা
গবেষক এবং রাজনীতিক
প্রধান নির্বাহী, ডেভেলপমেন্ট সিনার্জি ইন্সটিটিউট

২০২০ সালে বাংলাদেশে শ্রম পরিস্থিতি: একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

- আবু নাছের মাসুদ

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও যে কোন দেশের উন্নয়ন সাধারণ মানুষের কঠোর পরিশ্রমের ফসল। বাংলার কৃষক, বিভিন্ন সেক্টরে নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, প্রবাসী শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রমের ওপর দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন বৃহদাংশে নির্ভর করে। কিন্তু এই সাধারণ শ্রমিক, মজুর তথা সাধারণ মানুষ এর সুফল ভোগ করতে পারেনা, বরং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবানরাই এর সুফল ভোগ করে। অন্যদিকে শ্রমজীবী মানুষ পায়না তাদের কাঙ্ক্ষিত মজুরি এবং প্রাপ্য অধিকার। যা মহান মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন 'বৈষম্যহীন বাংলাদেশ' গড়ার ক্ষেত্রে এক বড় বাধা। কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে ২০২০ সালে বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি কেমন ছিল এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরার চেষ্ট করা হয়েছে। ২০২০ সালে দেশের বিভিন্ন সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন, সংগ্রাম, দাবি, শিল্প ও শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদনিট তৈরি করা হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধ ঘোষণা:

২ জুলাই ২০২০ সরকার দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ২৬টি পাটকল বন্ধ ঘোষণা করেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে বন্ধ ঘোষণার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে পাট শিল্পকে প্রতিযোগিতায় আনা। জাতীয় মজুরি উৎপাদনশীলতা কমিশন ২০১৫ অনুযায়ী সারাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকদের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করবে সরকার। বন্ধকৃত এসব পাটকলের প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিকের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে তাদের চাকরি শতভাগ অবসান করা হবে। এজন্য ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। শ্রমিকদের পাওনার অর্ধেকটা পারিবারিক সঞ্চয়পত্র করে দেয়া হবে, যেখানে তার ৩ মাসে ১১ শতাংশের মতো মুনাফা পাবে। ৩ মাস অন্তর যে টাকা শ্রমিকরা মুনাফাভিত্তিক পাবে, তা প্রতিদিন সে কাজ করে মাসে যে মজুরি পেত, তার চেয়ে বেশি টাকাই পাবে বলে সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ পাটকল শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের অংশ হিসেবে ঢাকার করিম জুট মিলের এক হাজার ৭৫৯ শ্রমিকের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রাথমিকভাবে 'লে অফ' শুরু হয়েছে। কিন্তু পাওনা নিয়ে শ্রমিকদের দুশ্চিন্তা কাটছেনা। তাদের ধারণা এর আগেও শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সঠিকভাবে তা পরিশোধ করা হয়নি। তারা বলেন, ২০১৪ সালে অবসরে যাওয়া ৮ হাজার ৯৫৪ জন শ্রমিকের টাকা এখনও বকেয়া রয়ে গেছে।

দেশে বর্তমানে মোট ৩১৪টি পাটকলের মধ্যে ৬৩টি কারখানা বন্ধ রয়েছে। বাংলাদেশ পাটকল সংস্থার (বিজেএমসি) নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলের সংখ্যা ২৭টি। আরো ছয়টি পাটকল পূণঃগ্রহণ করায় মোট সংখ্যা

৩৩টি, যার মধ্যে ৭টি পাটকল বন্ধ রয়েছে। বেসরকারি ২৮১টি পাটকলের মধ্যে ৫৬টি বন্ধ রয়েছে। এদিকে পাটকল বন্ধের সিদ্ধান্তকে নেতিবাচক হিসেবে দেখছেন দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। তারা পাটকল বন্ধের এ সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে এবং আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি (২৪ ডিসেম্বর ২০২০) দেশি-বিদেশী অর্থায়নে বন্ধ পাটকলগুলো আধুনিকায়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সচল করার সুপারিশ করেছেন। কমিটির বৈঠকে বন্ধ ঘোষিত পাটকল শ্রমিকদের পরিচয়পত্র সংশোধনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান ও মামলা প্রত্যাহার/নিস্পত্তি করে ছাটাইকৃত শ্রমিক কর্মচারীদের জরুরি ভিত্তিতে সব পাওনা পরিশোধের সুপারিশ করা হয়।

প্রবাসী শ্রমিকদের দিন-কাল:

কোভিড-১৯ আক্রান্ত বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রবাসী জনগোষ্ঠী ও প্রবাসী আয় এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। কর্মহীন হয়েছে মানুষ, নিম্ন আয়ের দেশগুলোর অর্থনীতি। উৎপাদনশীল খাত, বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন বৈশ্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায়ই বন্ধ থাকায় প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় খাদ্য সংকট দেখা দেয়ার উপক্রম হয়েছে। আইওএম-এর ওয়ার্ল্ড মাইগ্রেশন রিপোর্ট- ২০২০ অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অভিবাসীর সংখ্যা ২৭ কোটি ২০ লাখ। এরমধ্যে ৭৮ লাখ নিয়ে বাংলাদেশ ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে। বায়রার তথ্য মতে বিশ্বের ১০৬টি দেশে প্রতিবছর ১০ লাখ বাংলাদেশী শ্রমিক যায়। এরমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে বেশি শ্রমিক যায়, যেখানে প্রায় ৪০ লাখ লোক বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। বিশ্বের ২০টি দেশে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১,৫২২ জন বাংলাদেশী মৃত্যুবরণ করেছেন।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্র মতে ১ এপিল থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৩ লাখ ২৬ হাজার ৭৫৮ জন প্রবাসী কর্মী দেশে ফেরত এসেছেন। এদের মধ্যে অনেকেই কাজের মেয়াদ শেষ বা কাজ না থাকায় ফেরত এসেছেন। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইওএম পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, ফেব্রুয়ারি-জুন ২০২০ সময়কালীন বাংলাদেশের ১২ জেলায় যারা বিদেশ থেকে ফেরত এসেছেন তাদের প্রায় ৭০ শতাংশ জীবিকাহীন। অভিবাসীদের মধ্যে ৯৯ শতাংশ জানিয়েছেন, বাংলাদেশে জীবিকা নির্বাহের ভালো সুযোগ পেলে তারা দেশে থাকতে চান।

কোভিড-১৯ বিদেশ ফেরতদের জন্য সরকারি উদ্যোগ:

বিদেশফেরত অসহায়, ক্ষতিগ্রস্ত ও দরিদ্র প্রবাসী কর্মীদের পরিবারকে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলাভিত্তিক প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জেলা কর্মসংস্থান কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তালিকার ভিত্তিতে মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার থেকে ১ জুলাই ২০২০ জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের নির্দেশনা প্রদান করে। বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের পুনর্বাসনে ৭০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন এবং তাদের পুনঃপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে পূনরায় বিদেশ পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এছাড়া বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের করোনা পরীক্ষা ফি ৩,৫০০/- থেকে কমিয়ে ১,৫০০/- টাকা করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ এর কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে ফ্লাইট চালু থাকায় ফ্লাইট সঙ্কটের কারণে প্রবাসীদের টিকেট ও অন্যান্য (কোভিড টেস্ট, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ও উন্নয়ন ফি) খরচ প্রায় ৪ গুণ বেড়ে গেছে ফলে তারা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।

বিশ্বের কয়েকটি দেশে প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য কিছু সুযোগ ও সম্ভাবনা:

কাতার: অক্টোবর ২০২০ মধ্য প্রাচ্যের দেশ কাতারে বিদেশী শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মাসিক মজুরি এক হাজার রিয়াল নির্ধারণ করেছে, পাশাপাশি কর্মস্থল পাল্টানোর প্রক্রিয়া সহজ করেছে। একই সাথে মালিকপক্ষকে শ্রমিকদের বিছানাপত্র ও আবাসনের ব্যবস্থা নেয়া না হলে সে জন্য মাসে আরো ৮০০ রিয়াল শ্রমিকদের দিতে হবে। **উজবেকিস্তান:** মধ্য এশিয়ার দেশ উজবেকিস্তানে প্রথমবারের মতো ১,১২৭ জন বাংলাদেশী কর্মী পাঠানো হয়েছে। **মালয়েশিয়া:** মালয়েশিয়ায় অবৈধ থাকা চারটি খাতের (নির্মাণ, বনায়ন, উৎপাদন ও কৃষি খাত) শ্রমিকদের শর্তসাপেক্ষে ১৬ নভেম্বর ২০২০-জুন ২০২১ পর্যন্ত বৈধ হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। **ওমান:** ওমানে অবৈধভাবে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের সাধারণ ক্ষমার আওতায় ফিরে আসার সুযোগ দিয়েছে সে দেশের সরকার, যা ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

কোভিড-১৯ আক্রান্ত বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রবাসী জনগোষ্ঠী ও প্রবাসী আয় এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। কর্মহীন হয়েছে মানুষ, নিম্ন আয়ের দেশগুলোর অর্থনীতি। উৎপাদনশীল খাত, বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন বৈশ্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় খাদ্য সংকট দেখা দেওয়ার উপক্রম হয়েছে।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইউরোপ যাত্রা ও অন্যান্য দেশে অবস্থান:

স্বচ্ছলতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কখনও সাগর পাড়ি দিয়ে, সড়ক পথে, কখনও পায়ে হেঁটে ইউরোপ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন বাংলাদেশীরা। ইউএন এইচসিআর- এর তথ্য মতে ২০১৪ থেকে ২০২০ এর এপ্রিল পর্যন্ত ১৯ হাজার বাংলাদেশী ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছেন। এদিকে

দক্ষিণ আফ্রিকায় অবৈধভাবে যাওয়া প্রায় ৩ লাখ বাংলাদেশী চরম অনিশ্চয়তার মাঝে সেখানে বসবাস করছেন। এদের বেশিরভাগ অবৈধভাবে এবং কেউ আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে সেখানে আছেন এবং ছোটো-বড়ো ব্যবসা করছেন। গত চার বছরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ৪৫২ জন বাংলাদেশী হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন। শুধু ২০১৯ সালের প্রথম নয় মাসে ৮২জন খুন হয়েছেন। এদিকে ভিয়েতনামে কর্মসংস্থান ও উচ্চ বেতনের (৫০০ ডলার) আশায় ১,২০০ শ্রমিক সেখানে গিয়ে প্রতারণার শিকার হন। এদের মধ্যে অনেকে দেশে ফিরেছেন শূণ্য হাতে, অনেকে ভিয়েতনামে বাংলাদেশ দূতাবাসে ধর্না দিচ্ছেন দেশে ফিরে আসার জন্য। লেবাননে বাংলাদেশ দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানায় ৪০ হাজারের মতো অবৈধ বাংলাদেশী লেবাননে আটকে রয়েছেন। ফেরত আসতে বড় অংকের জরিমানা থাকায় তারা দেশে ফিরে আসতে পারছেন না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে জানা যায়, ২০২০ সালে প্রবাসীরা ২ হাজার ১৭ কোটি ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন যা ২০১৯ সালের তুলানায় ১৮ দশমিক ৬৬ শতাংশ বেশি (১ হাজার ৮৩২ কোটি ডলার) । ২০২০ সালে ১ লাখ ৮১ হাজার ২১৮ জন শ্রমিক বিদেশে গেছেন (আগস্ট ২০২০)। যা বিগত বছরের তুলনায় অনেক কম।

পোশাক শিল্প ও শ্রমিক:

২০২০ সালে পোশাক শিল্প বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ বহুমুখী সমস্যার সম্মূখীন হয়েছে। বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রেক্ষাপটে চলতি বছর সামগ্রিক পরিবেশ অনেকটাই ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। ২৬ মার্চ থেকে ২৫ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত করোনা সংক্রমণ এড়াতে বন্ধ ছিল অনেক শিল্প কারখানা। করোনা ভাইরাসে ১ জুন ২০ পর্যন্ত দেশের ১৯৩টি পোশাক কারখানার ৪৫৬জন শ্রমিক আক্রান্ত হয়েছেন। এরমধ্যে ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। শ্রমিকদের কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য বিজিএমইএ ঢাকা ও চট্টগামে ৪টি ল্যাব স্থাপন করেছে।

এ সময়ে তৈরি পোশাক খাতের ১ হাজার ৯১৫টি কারখানা 'লে-অফ' করা হয়েছে। বেকার হয়েছেন ৩ লাখ ২৪ হাজার ৬৮৪জন শ্রমিক। করোনায় ছাঁটাই আতংক সৃষ্টি করে শ্রমিকদের বেতন কমিয়েছেন তৈরি পোশাক মালিকরা। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারনাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) (১৭ ডিসেম্বর ২০২০) এক ওয়েবিনারে এ তথ্য প্রকাশ করে।

করোনা ভাইরাসের প্রভাবে এপ্রিল ২০২০ মাসে 'লে অফ' ও 'বন্ধ থাকা' পোশাক কারখানা শ্রমিকরা ৬০ ভাগ বেতন পাবেন। যেসব কারখানায় অল্প কিছু দিন কাজ হয়েছে সেখানকার শ্রমিকবৃন্দ পুরো মাসের বেতন পাবেন। এছাড়া ঈদের আগে কোনো শ্রমিক ছাঁটাই না করার বিষয়ে ত্রিপক্ষীয় (সরকার, মালিক ও শ্রমিক) সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেদনকালীন বেতন ও ঈদের ছুটি বৃদ্ধির দাবিতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকরা সড়ক মহাসড়ক অবরোধ করেছেন।

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের মাঝে প্রণোদনার অর্থ বিতরণ:

করোনাকালীন চাকুরি হারানো শ্রমিকদের প্রণোদনার অংশ হিসেবে প্রথম দফায় (২২ ডিসেম্বর ২০২০) ১ হাজার ৭৯৪ জন শ্রমিকের হাতে প্রণোদনার অর্থ তুলে দেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান। প্রণোদনা চলমান থাকবে বলে জানানো হয়। এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) কোভিড -১৯ মহামারিতে ছাঁটাই ও মজুরি কর্তনের শিকার গার্মেন্টস শ্রমিকদের সহায়তার জন্য ১ হাজার ১৫৮ কোটি টাকা দিবেন বলে জানিয়েছে।

গার্মেন্টস মালিকদের জন্য প্রণোদনা:

করেনোকালীন সরকার শ্রমিকদের মজুরির জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ গার্মেন্টস মালিকদের জন্য উন্মুক্ত রেখেছে। তাঁরা স্বল্পসুদে এ টাকা ঋণ নিতে পারবেন। এছাড়া গার্মেন্টস মালিকদের জন্য ঋণ, এলসি সেটলমেন্ট, পরিসেবার বিল পরিশোধ ছাড়াও ভ্যাট টাক্সসহ বেশ কিছু খাতে তাদের ছাড় এবং সুবিধা দেয়া হয়েছে। এদিকে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে তারা পোশাক শ্রমিকদের আগামী ২ বছর বার্ষিক মজুরির ৫ শতাংশ বৃদ্ধি করতে পারবেনা বলে শ্রম আইনের বিধান থেকে ২ বছরের অব্যাহতি চেয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠিয়েছে।

পোশাক শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও জীবন জীবিকা নিয়ে বিভিন্ন সংস্থার গবেষণা:

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়ন নিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-

এর পক্ষে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) ও যুক্তরাষ্ট্রের মাইক্রো ফাইনান্স অপরচুনিটিজ (এমএফও) এর বিভিন্ন সময়ের গবেষণায় বলা হয়- দেশের শ্রম আইন লঙ্ঘন করে বেশিরভাগ পোশাক কারখানার শ্রমিকদের দিনে ১০-১৩ ঘন্টার বেশি কাজ করানো হয়। বাড়তি আয়ের জন্য ওভারটাইমকে ইতিবাচক মনে করেন ৪৭ শতাংশ শ্রমিক। এ বিষয়ে ৫৩ শতাংশ শ্রমিকের নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে। ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামের ১১ পোশাক কারখানার ২ হাজার ১৮৪ শ্রমিক, ১১১ সুপারভাইজার ও ১১১ ব্যবস্থাপক এ সমীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। করোনা ভাইরাসের কারণে দেশের কমপক্ষে ৮২ শতাংশ শ্রমিকের জীবিকার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। পোষাক শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা ৩৪ শতাংশ তাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং ইউএন উইমেন এর এক প্রতিবেদনে জানা যায়, দেশের ২৯ শতাংশ নারী পোশাক কর্মীর প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা নেই। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্স এর মতে, করোনাকালীন নিয়মিত বেতন না পাওয়ায় ২৭ শতাংশ শ্রমিক নিজেদের খাদ্য চাহিদা কমিয়েছেন।

দীর্ঘমেয়াদী অপুষ্টির শিকার পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিক:

দেশের পোশাক শিল্পে কর্মরত আছেন প্রায় ৩৫-৪২ লাখ শ্রমিক। যার ৬০-৮০ শতাংশ নারী। কর্মরত নারী শ্রমিকদের ৪৩ শতাংশ দীর্ঘমেয়াদী অপুষ্টির শিকার, যার ফলে কমছে তাদের কর্মক্ষমতা ।

অ্যাকর্ড থেকে আরএসসি-এর যাত্রা:

পোশাক খাতের কর্মপরিবেশ সুরক্ষায় বিদেশি ক্রেতা, উৎপাদনকারী ও ট্রেড ইউনিয়নের যৌথ প্রয়াসে যাত্রা শুরু হয়েছে নতুন তদারক সংস্থা আরএমজি সাসটেইনেবিলিটি কাউন্সিল (আরএসসি)

পোশাক শ্রমিকের মৃত্যুজনিত সহায়তা:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কেন্দ্রীয় তহবিল হতে বিজিএমইএর অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় ৯১ জন শ্রমিকের মৃত্যুজনিত সহায়তা হিসেবে ১ কোটি ৮২ লাখ টাকা দেয়া হয়েছে। এছাড়া ২০২০ সালে তৈরি পোশাক শিল্পে ৩৭ জন আহত হয়েছেন।

সহায়তা পাচ্ছেন পোশাক-চামড়া শিল্পের কর্মহীন শ্রমিক:

রপ্তানিমুখী পোশাক-চামড়া শিল্পের কর্মহীন ও দুস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী পোশাক-চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে যারা কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সাময়িক ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মহীনতার মুখে পড়েছেন,অথবা অসুস্থ বা অন্য কোনো কারণে দুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাদের তিন মাস নগদ ৩০০০ টাকা করে সহায়তা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। G2P পদ্ধতিতে উপকারভোগী শ্রমিকদের নিজস্ব ব্যাংক একাউন্ট বা মোবাইল ব্যাংক একাউন্টে উক্ত টাকা পাঠানো হবে। নীতিমালা অনুযায়ী আট ধরণের শ্রমিক এ সহায়তা পাবেন। তবে নির্বাচিত শ্রমিক এসময়ের মধ্যে নতুন কর্মে নিযুক্ত হলে এ সহায়তা পাবেননা। উল্লেখ্য যে, এ কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার-এর পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী ইউরোপিয় ইউনিয়ন ও ফেডারেল জার্মান সরকার বাজেট সাপোর্টের মাধ্যমে এ অর্থায়ন করবে। নীতিমালার আওতায় ২০২০-২০২১ এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এটি বাস্তবায়িত হবে। সফলভাবে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে সরকার এ কার্যক্রমটিকে একটি স্থায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম হিসেবে পরিচালনার উদ্যোগ নিতে পারে।

চামড়াজাত পণ্য ও জুতা কারখানার নূন্যতম মজুরি চূড়ান্ত:

চামড়াজাত পণ্য ও জুতা কারখানা শিল্পখাতের শ্রমিকের নিম্নতম মজুরি ৭ হাজার ১০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যা ২০১৩ সালে ছিলো ৩ হাজার ৬৫২ দশমিক ৫০টাকা। ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী চামড়াজাত পণ্য ও জুতা কারখানায় শ্রমিকরা ছয়টি গ্রেডে বিভক্ত। উল্লেখ্য যে, চামড়াজাত পণ্য ও জুতা কারখানা শিল্পখাতের শ্রমিকের নিম্নতম মজুরি হার সুপারিশ করার জন্য ২০১৯ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে বোর্ড গঠন করা হয়।

> দেশের পোশাক শিল্পে কর্মরত আছেন প্রায় ৩৫-৪২ লাখ শ্রমিক। যার ৬০-৮০ শতাশ নারী। কর্মরত নারী শ্রমিকদের ৪৩ শতাংশ দীর্ঘমেয়াদী অপুষ্টির শিকার যার ফলে কমছে তাদের কর্মক্ষমতা।

কৃষি ও কৃষি শ্রমিক:

করোনাকালে দেশের ১৪টি কৃষি অঞ্চলের মধ্যে ৯টিতে কৃষি শ্রমিকের মজুরি কমেছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটের (ব্রি) এক গবেষণায় জানা যায়, করোনাকালে বোরো মৌসুমে শ্রমিকের মজুরি কমেছে। মজুরি কমার বিষয়ে ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবির বলেন, কোভিড-১৯ এর কারণে অনেকে শহর থেকে চাকুরি হারিয়ে গ্রামে চলে আসে। এই সময়টি মূলত বোরো মৌসুম। ফলে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর ধান কাটার শ্রমিক সরবরাহ বেশি ছিলো, ফলে মজুরি কমে যায়। এছাড়া অনেক জায়গায় যন্ত্রের মাধ্যমে ধান কাটা ও যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তবে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলে শ্রমিকের সংকট থাকার কারণে মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে।

রিপোর্ট অন এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল স্ট্যাটিসটিকস- ২০১৮ এর প্রতিবেদন মতে, দেশে বর্তমানে ৪৩ লাখ ৯২ হাজারের বেশি মানুষ কৃষি কাজের সাথে জড়িত। এরমধ্যে ৮৭ লাখ ৬৫ হাজার ১০৭ জন প্রায় ৩৫ দশমিক ৯০ শতাশ পারিবারিক হেলপার। ২০২০ সালে কৃষি খাতে ৬৭ জন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেছেন এবং আহত হয়েছেন ১০জন।

বিড়ি কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিক:

২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেটে বিড়ির উপর বৃদ্ধিকৃত অতিরিক্ত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে সারা দেশব্যাপী মানববন্ধন করেছেন বিড়ি শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকরা। মানববন্ধনে নেতৃবৃন্দ বিড়ি শ্রমিকদের দুর্দশা লাঘবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ৪ দফা দাবি পেশ করেন। দাবিগুলো হলো-বিড়ির উপর অতিরিক্ত ধার্য্যকৃত ৪ টাকা মূল্যস্তর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার, বিড়ির উপর ১০% অগ্রিম আয় কর প্রত্যাহার, বঙ্গবন্ধুর চালুকৃত বিড়িকে কুটির শিল্প হিসেবে অব্যাহত রাখা, বিড়ি শিল্পের বাজারকে ধ্বংস করে বিদেশী কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র বন্ধ করা। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ দাবি করেন, বাংলাদেশে বিড়ি কারখানায় প্রায় ২০ লক্ষ এবং সিগারেট কারখানায় নিয়োজিত আছেন আরো ১০ হাজার শ্রমিক, কিন্তু ২০১৯ সালে এনবিআর প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে নিয়মিত, অনিয়মিত ও চুক্তিবদ্ধসহ মোট বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যা ৪৬ হাজার ৯১৬ জন।

নৌযান শ্রমিক:

বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশনের আওতাধীন আটটি সংগঠন ১১ দফা দাবি আদায়ে ধর্মঘট করেন। তাদের দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- বাল্কহেডসহ সব নৌযান ও নৌপথে সন্ত্রাস চাঁদাবাজি বন্ধ ও ডাকাতি বন্ধ করা; যাত্রীবাহী লঞ্চের কর্মীদের জন্য ২০১৬ সালের ঘোষিত বেতন কাঠামোর পূর্ণ বাস্তবায়ন; ভারতগামী শ্রমিকদের ল্যান্ডিং পাস ও মালিক কর্তৃক খাদ্যভাতা প্রদান; প্রত্যেক নৌ শ্রমিককে মালিক কর্তৃক নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র ও সার্ভিসবুক প্রদান; নদীর নাব্যতা রক্ষা, প্রয়োজনীয় মার্কা, বয়া ও বাতি স্থাপন; কর্মস্থল কিংবা দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে শ্রমিকদের ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া; মাস্টার, ড্রাইভার পরীক্ষা, সনদ বিতরণ ও নবায়ন, বেআইনি নৌ চলাচল বন্ধ করা; সব নৌযান শ্রমিকের সমুদ্র ও রাত্রিকালীন ভাতা নির্ধারণ; এনডোর্স, ইনচার্জ, টেকনিক্যাল ভাতা পুন:নির্ধারণ; নৌ পরিবহন অধিদপ্তরে সব ধরণের অনিয়ম ও শ্রমিক হয়রানি বন্ধ এবং নৌযান শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ২০২০ সালে দেশের নৌ পরিবহন খাতে ১৫ জন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেছেন এবং আহত হয়েছেন ১৬জন।

ইটভাটার শ্রমিক:

বাংলাদেশের বিভিন্ন ইটভাটায় কাজ করে থাকেন লক্ষ লক্ষ নারী ও পুরুষ শ্রমিক। ইটভাটায় নিয়োজিত শ্রমিকরা মালিক কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার সচেতন করা হলেও দেশের ইটভাটার মালিকরা স্বাস্থ্য ঝুঁকি জেনেও শ্রমিকদের দিয়ে ইট তৈরি করিয়েছেন। তবে ইট ভাটার মালিকরা বলেছেন, লোকসানের ভয়ে তারা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করিয়েছেন।

গৃহকর্মে নিয়োজিত শ্রমিক:

দেশের অধিকাংশ বাসাবাড়িতে নিরাপদ নন গৃহশ্রমিকরা। এরা যেমন, নানা ধরণের নির্যাতনের শিকার হয় আবার মজুরি কম পায়। গৃহকর্মে নিয়োজিত শ্রমিকদের ৯০শতাংশ নারী ও শিশু। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-(বিল্‌স) এর তথ্যমতে, ২০১১ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৯ বছরে ২৬৯ জন গৃহকর্মী নির্যাতনের কারণে মারা গেছেন। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে, প্রতি বছর গড়ে ৩০জন গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা যাচ্ছেন। বিভিন্নভাবে নির্যাতিত কর্মীদের সংখ্যা আরো কয়েকগুণ।

গৃহশ্রমিকদের সুরক্ষা:

গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হলেও এর যথাযথ বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং আইনি কাঠামো না থাকায় নির্যাতন থামানো যাচ্ছে না। করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে তারা পড়েছেন নতুন সংকটে। তাদের কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়ে এসেছে। নীতিমালাটি প্রচারের জন্য গণমাধ্যম, মোবাইল এসএমএস পোস্টারিং, লিফলেট, বুকলেট প্রভৃতি মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে। সরকার কর্তৃক গৃহীত এই নীতির বাস্তবায়ন ও গৃহকর্মীদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। গৃহকর্মীরা বিপদের সম্মুখীন হলে জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে প্রতিকার পেতে পারেন। সর্বোপরি গৃহকমী, গৃহকর্ত্রী বা গৃহকর্তার ইতিবাচক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিই পারে গৃহকর্মী নির্যাতন বন্ধ করতে।

নির্মাণ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক:

দেশের অনেকগুলো দুর্ঘটনা প্রবণ খাতের মধ্যে ইমরাত নির্মাণ শিল্প একটি দুর্ঘটনা প্রবণ শিল্প হিসেবে চিহ্নিত। আবাসন

খাতের সহযোগী শিল্প হিসেবে প্রায় ২০০টি খাত এ শিল্পে কাজ করে। এর প্রায় ৩৫ লাখের মতো শ্রমিক জড়িত এবং এ সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের উন্নয়নের সবচেয়ে বড় অংশীদার এখাতের শ্রমিকরা করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে খেয়ে না খেয়ে কঠিন সময় কাটিয়েছে। ক্ষুধার জ্বালায় অনেকে লকডাউন ভেঙে রাস্তায় নেমে আসেন কাজের সন্ধানে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিপিআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, নির্মাণ খাতের সরকারি- বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ। আর এর ধাক্কা আসে শ্রমিকদের ওপর। এখাতের বড় অংশ নারী। শ্রমিকদের কোনো বীমা নেই। পোশাক খাত আলোচনায় এলেও নির্মাণ খাতের শ্রমিকরা আড়ালে থাকে। ২০২০ সালে দেশে ৮৪ জন নির্মাণ শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর শিকার হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন ৪৯ জন।

সর্বশেষ ২০১২ সালে নির্মাণ ও কাঠ শিল্প শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করার পর ১৫ নভেম্বর ২০২০ নির্মাণ ও কাঠ শিল্প শ্রমিকদের মজুরি মাসিক নিম্নতম ১৭ হাজার ৭২০ টাকা ও গ্রামাঞ্চলে ১৬ হাজার ২৪০ টাকা নির্ধারণের খসড়া সুপারিশ সবার অবগতির জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রকাশ করেছে। প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে কোনো আপত্তি বা সুপারিশ উপাত্তসহ নিম্নতম মজুরি বোর্ড চেয়ারম্যানকে পাঠানো যাবে। মজুরি বোর্ড বিবেচনা করে সরকারের নিকট তা সুপারিশ হিসেবে পেশ করবে।

মৎস্য শ্রমিক:

বার্ষিক জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ৩.৫৭ শতাংশ। বিগত ১০ বছরে মাছের উৎপাদন বেড়েছে ৫৮.৩৫ শতাংশ। কিন্তু সারা দেশের মানুষের মৎস্য চাহিদা পূরণ করে যে জেলেরা তারাই বঞ্চিত, তারাই সবচেয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করে থাকেন। দেশে সামুদ্রিক মাছের সুষ্ঠু প্রজননের লক্ষ্যে ২০ মে থেকে ২২ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে ৬৫ দিনের জন্য মাছ ধরা বন্ধ ছিল। ঐ সময় সরকার থেকে প্রতিটি জেলে পরিবারের জন্য ৪৩

কেজি চাল বরাদ্দ দেয়া হয়।

বেসরকারি সংস্থা কোস্ট ট্রাস্ট ২৩ জুন থেকে ১ জুলাই ২০২০ উপকূলীয় অঞ্চলে ২৮৪ টি জেলে পরিবার থেকে তথ্য নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করে। উক্ত গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, সরকার কর্তৃক প্রদেয় চাল ৩৪ শতাংশ জেলে পরিবার পায়নি। সরকারি সহায়তা হিসেবে চাল প্রাপ্তদের ৬৭.৫% বলেছেন, এই চাল তাদের সংসার চালানোর জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ সংসারের অন্যান্য খরচের জন্য নগদ সহায়তা নেই। ৯৬% জেলে বলেছেন, মহামারী করোনার সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের আওতায় তারা কোনো সহায়তা পাননি। মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন ৫১.৮% পরিবারে পারিবারিক সহিংসতা ও নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েছে বলে গবেষণায় জানা যায়। প্রতিবেদনকালীন ২৭জন মৎস্য শ্রমিকের মৃত্যু হয় এবং আহত হয় ৬৮ জন।

গণপরিবহনে নিয়োজিত শ্রমিক:

বাংলাদেশের গণপরিবহন খাতে প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছেন। কোভিড-১৯ এর কারণে সারাদেশে টানা ৬৭দিন গণ-পরিবহন বন্ধ ছিল। এসময়ে দেশের গণপরিবহন খাতে নিয়োজিত প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিক বেকার হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করেন। ১ জুন ২০২০ থেকে সীমিত পরিসরে গণপরিবহন চললেও পরিবহন শ্রমিকরা দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ২০২০ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৩৪৮ জন পরিবহন শ্রমিক নিহত এবং আহত হয়েছেন ৪৭ জন শ্রমিক।

রিকশা শ্রমিক:

ঢাকা শহরে বর্তমানে প্রায় ১১ লাখ বৈধ/ অবৈধ রিকশা চলাচল করে। এর সাথে জড়িত আছেন ১৫ লাখ রিকশাচালক। এদের মধ্যে ৭৮ শতাংশ রিকশার সরাসরি মালিক নন। এদের গড় আয় দৈনিক ১৩৬টাকা। প্রায় ৫৩ শতাংশ রিকশাচালক ঋণগ্রস্ত থাকেন। এ ঋণের টাকা তার পরিবারের ব্যয়, আগের ঋণ পরিশোধ ও স্বাস্থ্যসেবা বাবদ ব্যয় করেন। একজন রিকশাচালক রাজধানীতে গড়ে ১০ বছরের বেশি অবস্থান করেন। ৮৭ শতাংশ রাজধানীতে পরিবার নিয়ে বাস করেন। আবার ৫৫ শতাংশের বেশি চালকের গ্রামের পরিবারের সঙ্গে আর্থিক কোনো লেনদেন করতে হয় না।

কোভিড-১৯ এর সময়ে রিকশাচালকদের পরিবারে আয়সংকট চরম আকার ধারণ করে। ৩৮ শতাংশ কর্মহীন হয়ে পড়ে। তবে রিকশাচালকদের মধ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা নেই বললেই চলে। রিকশাচালকদের

মধ্যে ৮ শতাংশ সবসময় দীর্ঘমেয়াদি রোগে ভুগে থাকেন। এর পেছনে তাদের কিছু নেতিবাচক অভ্যাস কাজ করে, যেমন-৭২.৫ শতাংশ ধূমপায়ী, ৬০ শতাংশ চালক রাস্তার পাশে ফুটপাতে খাবার খেয়ে থাকেন। তবে চালকদের বেশিরভাগের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতা রয়েছে। গবেষণাটি ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৬০টি ওয়ার্ডের ১,২০০ রিক্সাচালকের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়। পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিশিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)-এই গবেষণা পারিচালনা করে।

জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক:

চট্টগামের সীতাকুন্ড উপজেলা থেকে কুমিরা পর্যন্ত প্রায় দেড় শতাধিক কোম্পানি জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের সাথে জড়িত। সাম্প্রতিক সময়ে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প খাতটি জিডিপির ক্ষেত্রে এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বেলজিয়ামভিত্তিক সংগঠন 'দ্য এনজিও শিপ ব্রেকিং প্ল্যাটফর্ম' ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে এতে দেখা যায়, ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ২৩৬টি জাহাজ ভাঙার জন্য আমদানি করে। যা বিগত বছরের তুলনায় শতকরা ২০.৪১ ভাগ বেশি। প্রায় ৫০ হাজার মানুষ এ শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছে। পরোক্ষভাবে আরো এক লাখ মানুষ জড়িত এ শিল্পে। যারা এখানে কাজ করে থাকেন তাদের বেশির ভাগ শ্রমিক উত্তরাঞ্চলের দারিদ্র্যপীড়িত এলাকা থেকে আসা। যে শ্রমিকদের শ্রমে, ঘামে, রক্তে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প টিকে আছে অথচ তারাই সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত। এই শিল্পের সাথে জড়িত মালিক ও সংশ্লিষ্টরা দিন দিন ধনী থেকে ধনী হচ্ছেন। জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প শ্রমিকেরা চরম অনিরাপদ কর্মপরিবেশ ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করলেও তারা ন্যূনতম জীবনধারণের মতো মজুরি পায়না। গত এক দশকে দুর্ঘটনায় প্রায় ৩ শতাধিক শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছে। এছাড়া ২০২০ সালে ২৩ জন শ্রমিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন এবং আহত হয়েছেন ২৯ জন।

২০১৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জাহাজভাঙ্গা শিল্পের শ্রমিকদের জন্য নতুন ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। কিন্তু ২ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হলেও মজুরি কাঠামো বাস্তবায়ন করেননি এ শিল্পের মালিকরা। মজুরি বাস্তবায়নের দাবিতে ১৫ নভেম্বর ২০২০ জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প ট্রেড ইউনিয়ন ফোরাম চট্টগ্রাম পুরনো রেল ষ্টেশন চত্বরে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ নিম্নোক্ত দাবি জানান- মাসিক ন্যূনতম মজুরি ১৬ হাজার টাকা প্রদান, নিয়োগকৃত শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রদান, শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, গ্রুপ বীমা ও প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু এবং শিপ রিসাইক্লিং বোর্ডে মালিক-শ্রমিক সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়োগ করা।

দোকান কর্মচারী:

সারাদেশের বিভিন্ন দোকানে কর্মরত আছেন প্রায় ৬০ লক্ষ দোকান কর্মচারী। করোনাভাইরাসের কারণে দেশব্যাপী লকডাউন ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ থাকায় দুর্দশায় পড়েছেন লক্ষ লক্ষ দোকান শ্রমিক ও কর্মচারী। চাকুরি না থাকায় তারা মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। দোকান কর্মচারীরা যে বেতন পান তা দিয়ে সংসার চালানো কঠিন। প্রতিনিয়ত ধার-দেনা করে তাদের চলতে হয়। দোকান কর্মচারীদের জন্য কোনো মজুরি বোর্ড নেই। সে কারণে মজুরিও নির্ধারিত নেই। বহুদিন ধরে তারা এ বিষয়গুলো নিয়ে আন্দোলন করছেন। আন্দোলনের ফলে ১৯৯৭ সালে সাপ্তাহিক ছুটি দেয়ার আইন করা হয়। এখনও তারা দোকান কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ ও মজুরি বোর্ড গঠনের আন্দোলন করছেন।

চা শ্রমিক:

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চা শিল্পের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শোষণের বহু পন্থার শিকার এই চা শ্রমিক জনগোষ্ঠী। মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতির কোনো কিছুই এখানে অনুসরণ করা হয়না। দেশের ১৬৭টি চা বাগানে প্রায় সোয়া লক্ষ শ্রমিক নিরলস শ্রম দিয়ে এ শিল্পকে টিকিয়ে রেখেছে। চা শ্রমিকদের মজুরি ৩০০ টাকা ও বিগত ২২ মাসের বকেয়া বোনাস পরিশোধের দাবিতে দেশের বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকরা ইতিমধ্যে কর্মবিরতি ও মানববন্ধন করেছে। এ প্রেক্ষিতে পূর্বের চুক্তির মেয়াদ ২১ মাস ১৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ১৫ অক্টোবর ২০২০ বাংলাদেশীয় চা-সংসদ ও বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে মজুরি

বাড়ানো বিষয়ক দ্বিপক্ষীয় নতুন চুক্তিতে চা শ্রমিকদের বেতন ১০২টাকা থেকে বাড়িয়ে এ ক্লাস বাগানে ১২০ টাকা, বি ও সি ক্লাস বাগানে যথাক্রমে ১১৮ ও ১১৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সরকার জরুরি পরিসেবা ব্যতীত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে। কিন্তু এসময় বন্ধ হয়নি দেশের চা-বাগানগুলো। কিছু চা বাগানের শ্রমিকরা নিজ উদোগে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

শিশু শ্রমিক:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শিশুশ্রম জরিপের তথ্যমতে দেশে প্রায় ১৭ লাখ শিশু বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত। এরমধ্যে ১২ লাখ ৮০ হাজার শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও ইউনিসেফের এক জরিপে জানা যায়, বাংলাদেশের শিশুরা নগর এলাকায় প্রায় ৩১০ রকমের অর্থনৈতিক কাজের সাথে জড়িত। বাংলাদেশ সরকার ৩৮ ধরণের কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে সেসব কাজে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

শিশুশ্রম নিরসনের জন্য জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ গঠন করা হয়েছে (বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে)। যেখানে সরকারের ২২টি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি রয়েছেন। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে এবং তারা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছেন। বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরণের শিশুশ্রম নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বিষয়ক এক বৈশ্বিক প্রতিবেদনে (২০২০) শিশুশ্রম বন্ধে বাংলাদেশে মাঝারি আকারের অগ্রগতি হয়েছে বলে মার্কিন দূতাবাস জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ৩ বছরে ৯০ হাজার শিশু শ্রমিককে বিপজ্জনক কাজ থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেককেই লেখাপড়ায় যুক্ত ও অনেককেই পুনর্বাসন করা হয়েছে। শুটকি মাছ উৎপাদন, ইটভাটা, পোশাক ও চামড়া উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিপজ্জনক কাজের সঙ্গে শিশুরা জড়িত বলে প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়।

দেশে অনিবন্ধিত কারখানা প্রায় ২০ হাজার:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠক থেকে জানা যায়, দেশে মোট ৬৪ হাজার ৮৮২টি কারখানা রয়েছে এরমধ্যে সরকারি ১৪০টি। এসব কারখানার ১৯ হাজার ৭২৭ টির কোন নিবন্ধন নেই।

হিউমান রাইট ও পিস ফর বাংলাদেশের করা এক রিটের শুনানি শেষে হাইকোর্ট বেঞ্চ বুড়িগঙ্গা নদীর আশেপাশের ২৩১টি অবৈধ কারখানা অবিলম্বে বন্ধ করতে পরিবেশ অধিদপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন ২০দিনের মধ্যে হাইকোর্টে জমা দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

করোনার প্রভাব কর্মসংস্থান ও মানুষের জীবন-জীবিকায়:

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো কোভিড-১৯ এর প্রভাব বাংলাদেশে পড়েছে, অর্থনীতিও ক্রমাগত বিপর্যস্ত। কোভিড-১৯ এর কারণে দেশের শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থান হারিয়েছে ৬৬ শতাংশ কর্মী আর গ্রামাঞ্চলে ৪১ শতাংশ। চাকুরি হারানোর দিক দিয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছে ঢাকা বিভাগ এবং এরপর রয়েছে সিলেট বিভাগ। দক্ষিণ এশিয়ায় করোনা পরিস্থিতি প্রকট হলে দারিদ্র্যের সংখ্যা বাড়বে। কারণ এ অঞ্চলে অনানুষ্ঠানিক খাতের সাথে অনেক মানুষ জড়িত। করোনা তাদের স্বাস্থ্যগত ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে। অনেকে খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে দেবে। ঋণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে ২২শতাশ মানুষ। এ তথ্যটি জানিয়েছেন বিশ্বব্যাংক গ্রুপের 'লুজিং লাইভলিহুড: দ্য লেবার মার্কেট ইমপাক্টস অব কোভিড-১৯ ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণায়। এছাড়া আইএলও-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়- কোভিড-১৯ এর কারণে বাংলাদেশে ২৭ দশমিক ৩৯ শতাংশ যুবক বেকার হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি ছয়জন যুবকের একজন কর্মহীন হয়েছেন। এছাড়া ভাগ্যের অন্বেষণে গ্রামে থেকে যারা শহরে এসেছেন এবং

> বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চা শিল্পের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শোষণের বহু পন্থার শিকার এই চা শ্রমিক জনগোষ্ঠী। মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতির কোনো কিছুই এখানে অনুসরণ করা হয়না। দেশের ১৬৭টি চা বাগানে প্রায় সোয়া লক্ষ শ্রমিক নিরলস শ্রম দিয়ে এ শিল্পকে টিকিয়ে রেখেছে। চা শ্রমিকদের মজুরি ৩০০ টাকা ও বিগত ২২ মাসের বকেয়া বোনাস পরিশোধের দাবিতে দেশের বিভিন্ন চা বাগানের আন্দোলনরত শ্রমিকরা ইতিমধ্যে কর্মবিরতি ও মানব-বন্ধন করেছে।

কোভিড-১৯ এর কারণে রাজধানী থেকে গ্রামে চলে গেছেন প্রায় ১৬ শতাংশ মানুষ। এই তথ্য জানিয়েছে বেসরকারি সংগঠন পিপিআরসি ও বিআইজিডি এক গবেষণায় ফলাফলে।

করোনায় বন্ধ হয়েছে ২১% ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান:

বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের অবদান ২৫ শতাংশ। করোনাকালে এ খাতের ২১ শতাংশ প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। এরমধ্যে ৬ শতাংশ স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন-আইএফসি এখাতের ওপর প্রভাব জানতে দেশের ৫০০টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টদের সাথে টেলিফোনে জরিপ চালিয়ে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনলাইন ওয়েবিনারে সভাপতির বক্তব্যে বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মিয়াং ভেবন বলেন, এসএমই

খাতের সঙ্গে দুই কোটি মানুষের কর্মসংস্থান জড়িত। করোনায় তাদের কঠিন সময় পার করতে হচ্ছে। তাদের আয় কমে গিয়েছে। অর্থনীতি সচল রাখার স্বার্থেই তাদের সহায়তা করতে হবে সরকারকে।

টাংগাইলে লক্ষাধিক তাঁত শ্রমিক কর্মহীন:

টাংগাইলের ঐতিহ্য তাঁতশাড়ী। তাঁত বোর্ড নিয়ন্ত্রিত জেলার দুটি বেসিক সেন্টারের মতে, জেলায় ১ লাখ ২০৬ জন তাঁত শ্রমিক রয়েছেন। আর ৪ হাজার ১৫১ জন রয়েছেন ক্ষুদ্র তাঁত মালিক। কোভিড -১৯ এর কারণে এসব শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ায় পরিবার-পরিজন নিয়ে তারা মানবেতর জীবন যাপন করছেন। যদিও সরকারের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও তাঁত বোর্ডে আবেদন করা হয়েছে বলে জানা যায়।

সিরাজগঞ্জে মজুরি বৈষমের শিকার নারী তাঁত শ্রমিক:

সিরাজগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্পের প্রসারে যে নারীরা মূল দায়িত্ব পালন করে থাকেন সে লাখো নারী শ্রমিক মজুরি বৈষমের শিকার। জানা যায় একটি শাড়ি বা লুঙ্গি তৈরিতে ৯ ধাপের মধ্যে ৬টি ধাপে মূল কাজ করে থাকেন নারী শ্রমিকরা। আর এ কাজ তারা যুগ যুগ ধরে করে আসছেন। কিন্তু এসব নারী শ্রমিকরা পুরুষের মত সমান তালে কাজ করলেও পুরুষের চেয়ে ৪ ভাগের ১ ভাগ মজুরি পান একজন নারী শ্রমিক। এ মজুরী বৈষম্য রোধে পোশাক শিল্পের মতো সরকারিভাবে নীতিমালা তৈরির দাবি জানিয়েছেন এ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও নেতৃবৃন্দ।

দৈনিক ভিত্তিতে কাজ করা শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ:

সরকারি দপ্তরে দৈনিক ভিত্তিতে কাজ করা শ্রমিকদের নতুন মজুরি হার নির্ধারণ করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। এখন থেকে ঢাকা ও চট্টগাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নিয়মিত দক্ষ শ্রমিক ৬০০টাকা ও অদক্ষ শ্রমিক পাবে ৫৭৫ টাকা। যা আগে ছিল ৫০০ (দক্ষ) ও ৪৭৫ (অদক্ষ) টাকা।

সিলেটে তিন বছরে ৭৪ পাথর শ্রমিকের মৃত্যু:

সিলেটে পাথর উত্তোলন, পরিবহন ও ভাঙ্গার কাজে নিয়োজিত আছেন প্রায় ৫ লক্ষ শ্রমিক। এ কাজটি ঝুঁকিপূর্ণ হলেও ৯৯ শতাংশ শ্রমিকই কোনো ধরণের সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করেন না। এতে তারা প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছেন। বেসরকারি সংগঠন বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা)-র এক প্রতিবেদনে জানা যায়, ২০১৭-এর জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৭৪জন শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। বেলার তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, অবৈধভাবে পাথর উত্তোলনকালে টিলা ধ্বংস কিংবা গর্ত খননকালে মাটি ও পাথরচাপায় মৃত্যুর ঘটনা বেশি ঘটছে। এছাড়া শ্রমিকদের অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ক্লান্তি, প্রশিক্ষণ না থাকা এবং অসাবধানতার কারণে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ৯৯ শতাংশ শ্রমিক কোনো ধরণের প্রশিক্ষণ ছাড়াই বছরের পর বছর এ কাজ করে যাচ্ছেন।

দেশের পল্লী বিদ্যুতে ১১৪ কর্মীর মৃত্যু, নেই মত প্রকাশ ও সংগঠন করার অধিকার:

২০১১ থেকে জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত গত নয় বছরে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (আরইবি) ১১৪ জন কর্মী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন। এর আগের ১৩ বছরে নিহত হয়েছেন ৩৮ জন। এসময়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন প্রায় ২ হাজার কর্মী (সূত্র: প্রথম আলো: ২৬ জানুয়ারি ২০২০)। উর্ধ্বতন মহলের গাফিলতির কারণ বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। তবে এসব ঘটনায় কারও বিরুদ্ধে মামলা ও কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। সারা দেশে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (আরইবি) ৮০টি সমিতি রয়েছে। এখানে ১৮ হাজার লাইনম্যান কাজ করে থাকেন। তাঁদের কোনো কর্মঘন্টা নেই, ২৪ ঘন্টাই যেখানে প্রয়োজন, সেখানে যেতে হয়। তেমন কোনো ওভারটাইম ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি ভাতাও নেই। একজন লাইনম্যানকে দিনে ১০-১৫টি সংযোগ নিয়ে কাজ করতে হয়। হাতে গ্লাভস ও পায়ে রাবারের বুট পরে সর্বোচ্চ ৭-৮টি সংযোগ দেয়া যায়। বেশি সংযোগ দিতে গিয়ে সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার না করা দুর্ঘটনার মূল কারণ বলে জানা যায়। বিশেষজ্ঞবৃন্দ বলছেন, প্রতিটি মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির আওতায়

আনা গেলে এ মৃত্যু অনেকটাই ঠেকানো যেতো। এছাড়া ১,৫০০ গ্রাহকের জন্য লাইনম্যান রয়েছেন ১জন। গ্রাহক রয়েছে ২ কোটি ৭০ লাখ। শ্রম আইন অনুযায়ী আরইবিতে ট্রেড ইউনিয়ন করতে বাধা না থাকলেও ট্রেড ইউনিয়ন করার অপরাধে ৫৮ জনকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরণের শাস্তি দেয়া হয়েছে। ৭ জনকে বরখাস্ত ও অনেককে তার এলাকা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে বদলি করা হয়েছে।

শ্রম অধিকার:

১৭ জুন ২০২০ ব্রাসেলসভিত্তিক আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন বিশ্বের ১৪৪টি দেশের শ্রম পরিস্থিতি মূল্যায়নের পর শ্রমিক অধিকার বিষয়ক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত ভয় ও নির্যাতনের মধ্যে থেকেই শ্রমিকদের অধিকারের চর্চা করতে হয়। ২০১০ সাল থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশে শ্রম অধিদপ্তরের যাচাই-বাছাইয়ে ১ হাজার ১০৪টি ট্রেড ইউনিয়ন আবেদনের ৫৭৫টি নিবন্ধণ পায়। এর মধ্যে ৮১টি ইউনিয়ন কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং ইউনিয়ন বিরোধী কার্যক্রমের চাপে নিষ্ক্রিয় রয়েছে।

শ্রম অধিকারের অনুপস্থিতি ও কোভিড-১৯ সময়কালীন বাংলাদেশী শ্রমিকদের দুর্দশা শীর্ষক শিরোনামে ২০২০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ইকোনমিকস স্টাডি সেন্টারের উদ্যোগে 'তৃতীয় বাংলাদেশ ইকোনমিকস সামিট' এর আলোচনায় উঠে আসে তৈরি পোশাক খাতে মাত্র ৬-৮ শতাংশ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যুক্ত। এর কারণ হচ্ছে শ্রমিকদের চাকুরি হারানোর ভয়। কারণ তারা বেতন কম হলেও চাকরিতে থাকতে/ফিরতে আগ্রহী। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর শ্রম অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে আলোচনা শুরু হলেও ধীরে ধীরে তাতে ভাটা পড়ে যায়। ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যাও আশানুরূপ বাড়েনি। সবকিছু মিলিয়ে শ্রম অধিকারে বাংলাদেশের অবস্থা খুবই নাজুক।

মামলা নিষ্পত্তিতে ধীরগতি: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- (বিল্‌স) এর তথ্য মতে বাংলাদেশের শ্রম আদালতের মামলাগুলো ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে শেষ করার আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলেও বড় বড় কোম্পানির মামলা ৭-৮ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। এই মামলাগুলো নিষ্পত্তি হতে বিশেষ কারণে ৬০ দিন থেকে ৯০ দিন বা ১৫০ দিন লাগতে পারে। কিন্তু ৭-৮ বছর গড়ানো কোনোভাবেই কাম্য নয়।

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের উচ্চতর ঝুঁকি: পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা সমাজের একটি গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকেন। যা করোনাভাইরাসের কারণে লকডাউনের সময়েও অব্যাহত ছিলো। গৃহস্থালি বর্জ্য নিয়ে দিনভর কাজ যাদের, সংক্রমণের ঝুঁকিও তাদের বেশি। কিন্তু তাদের সুরক্ষায় বিশেষ পোশাক তো দূরের কথা, ছিলনা মাস্ক ও গ্লাভস। অথচ একজন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী আক্রান্ত হলে তার মাধ্যমে আক্রান্ত হতে পারে প্রতিটি বাসা, ভেঙ্গে পড়তে পারতো নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনাও। বেসরকারি সংস্থা ওয়াটার এইড এপ্রিল-জুন ২০২০ ছয় সপ্তাহব্যাপী বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও পাকিস্তানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করে। এতে দেখা যায়, বেশিরভাগ পরিচ্ছন্নতাকর্মী পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্টে (পিপিই) সম্পর্কে ধারণা থাকলেও যথাযথ সরবরাহ ও ব্যবহার প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। কিছু নিয়োগকারী কর্তৃক পিপিই সরবরাহ করা হলেও এর মাপ, গুণগত মান ও পর্যাপ্ততার মধ্যে অসংগতি লক্ষ্য করা গেছে। অনেকেই সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করেন না। ফলে দীর্ঘদিন এ পেশায় কাজ করায় তাদের বেশিরভাগই নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, ফুসফুস, ত্বকে ক্যান্সার ও চর্মরোগে ভুগছেন।

বিশ্ব শ্রম পরিস্থিতি:

কোভিড-১৯ এর কারণে এশিয়া অঞ্চলে চাকুরি হারিয়েছে ৮ কোটি মানুষ: কোভিড-১৯ এর কারণে পুরো বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক হয়ে পড়েছে। করোনার প্রভাবে এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলে ৮ কোটি ১০ লাখ মানুষ চাকুরি হারিয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর এশিয়া প্যাসিফিক এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল আউটলুক ২০২০: ন্যাভিগ্যাটিং দ্য ক্রাইসিস টুওয়ার্ডস আ হিউম্যান-সেন্টার্ড ফিউচার অব ওয়ার্ক শীর্ষক প্রতিবেদনের মাধ্যমে এ তথ্যটি জানা যায়।

> আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন বিশ্বের ১৪৪টি দেশের শ্রম পরিস্থিতি মূল্যায়নের পর শ্রমিক অধিকার বিষয়ক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। উক্ত প্রতিবেদনে শ্রম অধিকার চর্চায় নিম্নের ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষস্থানে রয়েছে। যা ২০১৭ সাল থেকে চলমান রয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়- বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত ভয় ও নির্যাতেনের মধ্যে থেকেই শ্রমিকদের অধিকারের চর্চা করতে হয়।

উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, এ অঞ্চলে করোনার প্রভাব সুদুরপ্রসারী। নতুন কর্মসংস্থান অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েছে। চাকুরিতে যারা আছেন তাদেরও কর্মঘন্টা কমেছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, করোনার কারণে পুরুষের চেয়ে নারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশি। তারা বেশি চাকুরি হারিয়েছেন। এছাড়া তরুণদের চাকুরি হারানোর পাশাপাশি কর্মঘন্টা কমায় বেতন কমেছে এবং আয়ও কমেছে। আইএলও-এর মতে ১ দশমিক ৯০ ডলারের নিচে দিনে আয় করেন এমন মানুষের সংখ্যা এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলে ৯ কোটি ৪০ লাখ থেকে বেড়ে ৯ কোটি ৮০ লাখ হবে এ বছর।

এশিয়া প্যাসিফিকে বাংলাদেশের ন্যূনতম মজুরি সবচেয়ে কম:

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ন্যূনতম মজুরি সবচেয়ে কম। শুধু তাই নয়, এ অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই ন্যূনতম মজুরি আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার সবচেয়ে নিচের স্তরের চেয়েও কম। আইএলও গ্লোবাল ওয়েজ রিপোর্ট ২০২০-২০২১ শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়। ২০১৯ সালে ক্রয় ক্ষমতা সমতার (পিপিপি) ভিত্তিতে যে বৈশ্বিক গড় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয় তা ছিল ৪৮৬ ডলারের সমান। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে ন্যূনতম মজুরি গড় ৩৮১ ডলার (পিপিপি)। এর মধ্যে সবচেয়ে কম মজুরি হার বালাদেশে ৪৮ ডলার (পিপিপি)। আইএলও-এর উক্ত প্রতিবেদনে দারিদ্র্যসীমার ৩টি স্তরের কথা বলা হয়েছে। সবচেয়ে নিচের স্তরটি হচ্ছে ১ দশমিক ৯ ডলার (পিপিপি)। এর ওপরের স্তর ৩ দশমিক ২ ডলার (পিপিপি) এবং সবার ওপরেরটি ৫ দশমিক ৫ ডলার (পিপিপি)। এরমধ্যে এশিয়া প্যাসিফিকে নিম্নস্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। ২০১০-২০১৯ সালের মধ্যে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ২২টি দেশে প্রকৃত ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কমেছে ৮টি দেশে তন্মধ্যে বাংলাদেশ ও শ্রীলংকা রয়েছে।

আধুনিক দাসত্বের সূচকে চরম ঝুঁকিপূণ বাংলাদেশ:

মহামারি করোনাভাইরাসের প্রভাবে আধুনিক দাসত্বের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থা চরম ঝুঁকিপূর্ণ। এতে আরো রয়েছে ভারত, চীন ও মিয়ানমার। ঝুঁকি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ভেরিস্ক মাপলক্রফটের প্রকাশ করা 'আধুনিক দাসত্ব সূচক (মডার্ন স্ল্যাভারি ইনডেক্স)' বিশ্লেষণ করে এ তথ্য পাওয়া যায়। শ্রম দাসত্ব সূচকের ১৯৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮ এবং ভারত রয়েছে ২৫তম স্থানে। এছাড়া বিশ্বের ৩২টি দেশকে আধুনিক দাসত্ব সূচকের বড় ধরণের ঝুঁকির তালিকায় রাখা হয়েছে, তার মধ্যে এশিয়ায় বাংলাদেশ এবং ভারত রয়েছে।

দুই হাজার ধনীর হাতে ৪৬০ কোটি মানুষের চেয়েও বেশি সম্পদ:

সুইজারল্যান্ডের দাভোসে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক নেতাদের বার্ষিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম সম্মেলনের পূর্বে আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা অক্সফাম জানিয়েছেন, বিশ্বে ২ হাজার ১৫৩ জন লোকের মালিকানায় দরিদ্রতম ৪৬০ কোটি লোকের মালিকানায় থাকা মোট অর্থের চেয়েও বেশি অর্থ রয়েছে। অথচ মজুরিবিহীন ও কম মজুরি পাওয়া নারী ও নারীদের শ্রম প্রতি বছর বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রযুক্তি শিল্পগুলোর চেয়ে তিনগুণ বেশি মূল্য সংযোজন করছে।

- আবু নাছের মাসুদ
নাগরিক উদ্যোগ-এ সিনিয়র কর্মসূচি কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছেন।

(শ্রম সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটি ২০২০ সালে বিভিন্ন গণ-মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।)

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তথ্যানুসন্ধান

গুজব রটিয়ে ধর্মীয় উন্মাদনা: লালমনিরহাটে শত মানুষের উপস্থিতিতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

- মারুফিয়া নুর

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলায় মসজিদের ভেতরে কোরআন শরীফ অবমাননার গুজব রটিয়ে আবু ইউনুছ মো: শহীদুন্নবী জুয়েল নামে একজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। কোরআন অবমাননার অভিযোগ এনে উন্মত্ত জনতা ভিকটিম শহীদুন্নবী জুয়েল এর বন্ধু সুলতান মো. রুবাইয়াত সুমনকে মারধোরও করে। এক পর্যায়ে শহীদুন্নবীকে পিটিয়ে হত্যা করে তার লাশ পুড়িয়ে দেয়। উল্লেখ্য শহিদুন্নবী ছিলেন রংপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলের লাইব্রেরিয়ান। একবছর পূর্বে তার চাকরি চলে যায়। একারণে তিনি কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন এবং এর জন্য তিনি চিকিৎসাও নিচ্ছিলেন।

গত ২৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখে রংপুর নগরীর শালবন নিবাসী শহীদুন্নবী জুয়েল পাটগ্রামে তার বড় বোন ও বন্ধু পাটগ্রাম উপজেলা চেয়ারম্যান রুহুল আমিনের বাসায় যাবেন বলে বন্ধু রুবাইয়াত সুমনকে সাথে নিয়ে পাটগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বিকেল ৪ টার সময় পাটগ্রামে পৌঁছে বুড়িমারী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে আসরের নামাজ আদায় করেন। রুবাইয়াত তার মুঠোফোনটি মসজিদের পাশের দোকানে চার্জে দিয়েছিলেন। তিনি নামাজ শেষে ফিরে এসে দেখেন শহীদুন্নবীর সাথে মসজিদের খাদেম এর কথা কাটাকাটি হচ্ছে। এই সময় শহীদুন্নবী কিছু অসংলগ্ন কথা বার্তাও বলেন- "আমি গোয়েন্দা সংস্থার লোক, এদের নামাজ কালাম হয় না। আমি মসজিদ তল্লাশী করব। " এসব শুনে শহীদুন্নবীকে শান্ত থাকতে বলেন রুবাইয়াত এবং মুসল্লীদের কাছে ক্ষমাও চান এর জন্য। এসময় মসজিদের বাইরে অবস্থানরত হোসেন আলী নামে এক মুসল্লীসহ ৫/৬ জন মুসল্লী মসজিদে ঢুকে শহীদুন্নবীকে বাইরে নিয়ে এসে মারধোর করে।

পরে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য হাফিজুল ইসলাম তাদের ইউনিয়ন পরিষদে নিয়ে আটকে রাখেন। ইতিমধ্যে আশেপাশে গুজব ছড়িয়ে পড়ে কোরআন অবমাননার দায়ে দুজন ব্যক্তিকে ইউনিয়ন পরিষদে আটকে রাখা হয়েছে। এই গুজবে ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে অনেক মানুষ একত্রিত হয়। খবর পেয়ে ইউএনও, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং পাটগ্রাম থানার ওসি ঘটনাস্থলে আসেন, কিন্তু জনতার উন্মত্ততায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। একপর্যায়ে জনতার চাপে তারা পার্শ্ববর্তী ব্যাংকে গিয়ে আশ্রয় নেন। অন্যদিকে পাটগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুমন্ত কুমার ইউনিয়ন পরিষদে যে কক্ষে শহীদুন্নবী ও তার বন্ধুকে

আটকে রাখা হয়েছিল সেখানে প্রবেশ করে তাদের উদ্ধারের চেষ্টা করে। কিন্তু বাইরে থাকা উন্মত্ত জনতা এক পর্যায়ে গেট ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে জুয়েল ও রুবাইয়াতকে গণপিটুনী দিতে শুরু করে। ওসি জনতাকে থামাতে ব্যর্থ হন এবং উন্মত্ত জনতা শহীদুন্নবীকে ব্যাপক মারধর শুরু করে। ওসি শহীদুন্নবীর বন্ধু রুবাইয়াতকে বাচাঁতে তাকে নিয়ে ছাদে চলে যান। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেখান থেকে রুবাইয়াতকে কোনভাবে রক্ষা করতে সমর্থ হন।

অন্যদিকে উত্তেজিত জনতা শহীদুন্নবীকে পিটিয়ে হত্যা করে এবং একপর্যায়ে তার লাশ টেনে হেঁচড়ে পাটগ্রাম-বুড়িমারী মহাসড়কে নিয়ে যায় এবং শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পাটগ্রাম ও হাতীবান্ধা থানা পুলিশ, বিজিবি, ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দফায় দফায় চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। বিক্ষুব্ধ জনতার ছোড়া ইট পাথরের আঘাতে আহত হন পুলিশ সদস্যরা। রাত সাড়ে ১০টার দিকে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার অতিরিক্ত পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। কিন্তু ততক্ষণে শহীদুন্নবীর শরীর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অন্যদিকে শহীদুন্নবীর বন্ধু রুবাইয়াতকে আহত অবস্থায় লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

গুজব ছড়িয়ে এই বর্বরোচিত ঘটনার প্রেক্ষিতে গত ৪ নভেম্বর ২০২০ নাগরিক উদ্যোগ এর পক্ষ থেকে ১৪ সদস্যের একটি দল তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। তারা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজনের সাথে কথা বলেন। এছাড়াও এস আই, চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যদের সাথেও ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করে। পরিদর্শনকারী দল এর তথ্যমতে-ইউনিয়ন পরিষদের সদর দরজার লোহার গেইট এর কিছু অংশ এবং বারান্দার পাশের গ্রিলের তৈরি গেইটটি পুরোটাই ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি কক্ষের প্রতিটি দরজা-জানালা ভেঙ্গে ফেলে তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের যে কক্ষে আবু ইউনুস মোঃ শহীদুন্নবী জুয়েলকে রাখা হয়েছিল এবং যেখানে তাকে হত্যা করা হয় সেই কক্ষের মেঝেতে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে এবং এই রক্ত আসবাবপত্র কাগজপত্রে লেগে রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের কাগজপত্র এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। শহীদুন্নবীর বন্ধু রুবাইয়াতকে রক্ষা করার জন্য যে সিঁড়ি বেয়ে ওসি তাকে নিয়ে গিয়েছিল, সেই সিঁড়ির রেলিংগুলো ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে নাগরিক উদ্যোগ এর তথ্যানুসন্ধানকারী দল এই বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদে একটি মানববন্ধনের আয়োজন করে। পাটগ্রাম-কুড়িগ্রাম মহাসড়কের যে স্থানে শহীদুন্নবীর আগুন লাগিয়ে তার লাশটি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, সেই স্থানে এই নির্মম ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করে নাগরিক উদ্যোগ এর প্রতিনিধি দল। স্থানীয় অনেকেই এই মানববন্ধনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে।

নিহত শহীদুন্নবী রংপুর শহরের শালবন রোকেয়া সরণি এলাকার বাসিন্দা এবং রংপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলে গ্রন্থাগারিক ছিলেন, বছরখানেক আগে তার চাকরি চলে যায়। এরপর থেকে তিনি মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন। তার একটি কন্যা ও একটি ছেলে সন্তান আছে। জানা যায়, তিনি খুব ধার্মিক ছিলেন, নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। অথচ কোরআন অবমাননার অভিযোগে তাকে প্রাণ দিতে হলো।

নিহত শহীদুন্নবীর চাচাতো ভাই, পাটগ্রাম থানার উপ-পরিদর্শক শাহজাহান আলী ও বুড়িমারীর ইউপি চেয়ারম্যান বাদি হয়ে পৃথক তিনটি মামলা করেন। ঘটনা তদন্তে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসক তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে। এই ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে ঘটনার তদন্তের জন্য দুই সদস্যের একটি দল গঠন করা হয়েছে।

গুজব রটিয়ে বা ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে এই ধরণের হত্যার ঘটনা এর পূর্বেও অনেক ঘটেছে। ইতিপূর্বে ২০১৯ সালের জুলাই মাসে ঢাকার বাড্ডা অঞ্চলে তসলিমা বেগম রেনু নামে এক নারীকে ছেলেধরা সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ঢাকার উত্তর বাড্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সন্তানকে ভর্তি করার জন্য তথ্য জানতে গেলে শিশু অপহরণকারী সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এছাড়াও ফেসবুকে কোরআন অবমাননার গুজব রটিয়ে ২০১২ সালে কক্সবাজারে সাম্প্রদায়িক হামলা ঘটানো হয়, যা পরবর্তীতে চট্টগ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে।

শুধুমাত্র গুজব ছড়িয়ে এরকম নির্মম ঘটনা কারো কাম্য নয়। শহীদুন্নবী হত্যার ঘটনায় কোরআন অবমাননার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তথ্যানুসন্ধানে মসজিদের খাদেমের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, সেখানে কোন কোরআন অবমাননার ঘটনা ঘটেনি।

শহীদুন্নবী জুয়েল এর মতো এরকম উন্মত্ততার শিকার যেন আর কেউ না হয় তার জন্য জনসচেতনতা তৈরির পাশাপাশি এরকম ঘটনার সঠিক তদন্ত, সুষ্ঠু বিচার হওয়া খুবই জরুরি। কারণ একমাত্র সুষ্ঠু ও সঠিক তদন্তের মাধমেই বেরিয়ে আসবে কি করে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত লোক একত্রিত হয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠল। এর পেছনে কি শক্তি কাজ করেছে? প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধির উপস্থিতিতে তাদের নির্দেশ তোয়াক্কা না করে, জনগণ এইরকম হত্যার ঘটনা ঘটিয়েছে। ঘটনার পিছনের বিষয়গুলো সুক্ষ্মভাবে বিচার করে এর সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, আইনগত দিকগুলো বিশ্লেষণ খুবই জরুরি। তবেই হয়ত এরকম দুঃখজনক নির্মম ঘটনাগুলো আমরা প্রতিহত করতে পারব।

- মারুফিয়া নুর
নাগরিক উদ্যোগ-এ প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত।

লাকিংমে অপহরণ ও হত্যা: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতনে নির্বিকার থাকার আরেকটি নির্মম পরিণতি

- নাগরিক উদ্যোগ ডেস্ক প্রতিবেদন

কক্সবাজার সদর হাসপাতালের হিমঘরে আইনী জটিলতার কারণে কিশোরী লাকিংমে চাকমার লাশ ২৬ দিন পড়ে ছিল। এই কিশোরীর বাবা এবং স্বামী উভয়ই লাশের জন্য আইনের আশ্রয় নিয়েছিল। পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে লাকিংমের মরদেহ তার বাবার কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতো ছোট বয়সেই কঠিন নির্মমতার শিকার হতে হয়েছিল লাকিংমেকে।

লাকিংমে চাকমা জনগোষ্ঠীর দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই তাকে মরতে হলো চরম নির্মমতার শিকার হয়ে। ২০২০ সালের ৫ জানুয়ারি তাকে অপহরণের পর থেকে ৯ ডিসেম্বর, ২০২০ যেদিন সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়, সেই পর্যন্ত মেয়েটির সাথে ঘটেছে অনেকগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। অপহরণ, বাল্যবিয়ে, ধর্মান্তকরণ, অল্প বয়সে সন্তান ধারণ, শিক্ষা থেকে ঝড়ে যাওয়া সহ নানা ধরণের নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে।

গণমাধ্যম থেকে আমরা জানতে পারি কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার শীলখালীর চাকমাপাড়ায় বসবাসরকারী লালা অং চাকমার মেয়ে লাকিংমে শাপলাপুর উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। ১৪ বছর বয়সী এই কিশোরীকে ২০২০ সালের ৫ জানুয়ারি অপহরণ করা হয়। পরিবারের অভিযোগ ৫ জানুয়ারি ২০২০ সালে লাকিংমেকে আতাউল্লাহ নামে স্থানীয় এক যুবক অপহরণ করে। আতাউল্লাহর বাড়ি লাকিংমের বাড়ি থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে বাহার ছড়ায়। লাকিংমের বাবা স্থানীয় ইউপি সদস্যকে বিষয়টি জানান। কিন্ত ইউপি সদস্য বিষয়টিকে আমলেই নেননি। মেয়ের অপহরণের কথা শুনে লাকিংমের বাবা বিষয়টি স্থানীয় মডেল থানায় মামলা করতে গেলে তৎকালীন ওসি মামলা নিতে রাজি হননি। এরপর ২৭ জানুয়ারি ২০২০ লালা অং চাকমা কক্সবাজার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে একটি মামলা করেন। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে কক্সবাজার পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্তের দায়িত্ব দেন। পিবিআই তদন্ত প্রতিবেদনে লাকিংমে চাকমার অপহরণ এর অভিযোগের কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি বলে উল্লেখ করে। প্রতিবেদনে জানানো হয় স্বেচ্ছায় চলে গেছে এবং তার বয়স ১৪ বছর উল্লেখ করা হয়।

গণমাধ্যম থেকে জানা যায়, অপহরণের পর আতাউল্লাহ লাকিংমেকে কুমিল্লায় নিয়ে যায়। সেখানে আতাউল্লাহ একটি গ্যারেজে কাজ করত। কুমিল্লায় থাকাকালীন জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করে তাকে বিয়ে করে আতাউল্লাহ। এরপর ৯ ডিসেম্বর ২০২০ আতাউল্লাহর সাথে লাকিংমের কথা কাটাকাটি হয় এবং আতাউল্লাহ লাকিংমেকে চড় মারে। এই ঘটনায় বাহারছড়ার বাড়িতে বিষপান করে লাকিংমে। উল্লেখ্য এর ১২ দিন আগে সে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। ঘটনার পর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা করে জানান হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। এরপর হাসপাতালের নিয়ম মোতাবেক পুলিশকে জানানো হয় এবং ১০ ডিসেম্বর ২০২০ লাকিংমের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। এরমধ্যে আতাউল্লাহ তাকে স্ত্রী দাবি করে মরদেহ চায়। অন্য দিকে লাকিংমের বাবা মেয়ের ১১ মাস পর মেয়ের খোঁজ পান পুলিশের কাছ থেকে, তবে সেটা হলো মৃত্যু সংবাদ এবং তার লাশ মর্গে পড়ে আছে। কক্সবাজার পুলিশ তাকে ডাকে মেয়ের লাশ শনাক্ত করার জন্য। কিন্তু লাশ তিনি শনাক্ত করলেও নিতে পারেননি। কারণ লালা অং চাকমা লাশ নিতে গিয়ে জানতে পারেন সেই অপহরণকারী আতাউল্লাহ লাশ নেয়ার জন্য আদালতে আবেদন করেছে। সেখানে মেয়ের বয়স দেখিয়েছে ১৮ বছর। মেয়ের লাশ পাওয়ার জন্য লালা অং আবেদন করে, এরপর শুরু হয় আইনি প্রক্রিয়া। অর্থাৎ কোন পরিচয়ে শেষকৃত্য হবে লাকিংমের। কারণ স্বামীর দাবি লাকিংমে ধর্মান্তরিত হয়েছে এবং তার নামও পরিবর্তন করা হয়েছে।

ঘটনার ২৫দিন পর আদালতের নির্দেশে লাকিংমের মরদেহ তার বাবামাসহ নিকট আত্মীয়দের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা জানান, লাকিংমে নাবালিকা ছিল, প্রচলিত আইনে বিয়ের উপযুক্ত হয়নি এর সত্যতা পাওয়া গেছে। তাই তার বিয়ে হলেও সেটা আইনত অবৈধ। তাই তার বাবা মার কাছে শেষকৃত্যের জন্য লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। আর এই মামলার বিচার কার্য অপহরণ মামলা হিসেবে চলবে।

লাকিংমের মৃত্যু আমাদের প্রশ্নবিদ্ধ করে, চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায় মেয়েরা নিরাপদে নেই, অপহরণ, বাল্যবিয়ে, ধর্মান্তরকরণ এর মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটার পরও আমাদের বিচার ব্যবস্থা সেটা প্রমাণ করতে পারেনি। যদি তখনই কঠোরভাবে আতাউল্লাহর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যেত তবে হয়ত লাকিংমে বেঁচে যেত। শুধুমাত্র আমাদের একটু সদিচ্ছা বাঁচিয়ে দিতে পারতো মেয়েটির জীবন। আমাদের চারপাশে আতাউল্লাহর মত অনেক অপরাধীরা ঘুরে বেরাচ্ছে, যদি ন্যায় বিচার না হয় তবে লাকিংমেদের মৃত্যু থামানো যাবে না কোনদিন।

এখন লাকিংমের বাবার মত আমাদেরও সবার প্রশ্ন লাকিংমে মৃত্যুর পর ন্যায়বিচার পাবে কিনা? আরও প্রশ্ন রয়ে যায় লাকিংমের ছোট্ট কন্যা আতিফা সে বড় হবে কোন পরিচয়ে?

-

সুনামগঞ্জের শাল্লায় হিন্দু পল্লীতে আরেকটি সংঘবদ্ধ হামলা: এই সাম্প্রদায়িকতার শেষ কোথায়

- নাগরিক উদ্যোগ ডেস্ক প্রতিবেদন

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলা নতুন কোন বিষয় না। ব্যক্তিগত শত্রুতা, সম্পদ দখল, জমিজমা দখল, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি- নানা কারণে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। নাসিরনগর, গোবিন্দগঞ্জ, রামু, সাঁথিয়া, গঙ্গাচড়ার পর সর্বশেষ সুনামগঞ্জের শাল্লায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর সংঘবদ্ধ হামলা সংগঠিত হতে দেখা গেছে। সাম্প্রতিক সুনামগঞ্জের শাল্লায় হিন্দু পল্লীতে হামলা করা হয় খুবই পরিকল্পিতভাবে, যথেষ্ট সময় নিয়ে, মাইকে ঘোষণা দিয়ে লোক জড়ো করে। পুলিশ অন্তত: ১২ ঘন্টা আগে তথ্য জেনেও হামলা ঠেকাতে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ হামলার শিকার সংখ্যালঘু গ্রামবাসীদের।

গত ১৫ই মার্চ ২০২১ সোমবার সুনামগঞ্জের দিরাইয়ে হেফাজতে ইসলাম শানে রিসালাত নামে এক ইসলামি জলসার আয়োজন করে। সেখানে হেফাজতে ইসলামের নেতা মামুনুল হকের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ঝুমন দাশ নামের এক তরুণ ফেসবুকের মাধ্যমে তার সমালোচনা করে একটি স্ট্যাটাস দেন, যা হেফাজতের দৃষ্টিতে আপত্তিকর মনে হয়। হেফাজতে ইসলাম পরদিন মঙ্গলবার এর প্রতিবাদে সমাবেশ ও মিছিল করে। ঐ দিনই রাত ৮ টার দিকে পাশের কাশিপুরসহ আরো কয়েকটি গ্রামের হেফাজত সমর্থকেরা প্রথমে হিন্দু পল্লী নোয়াগাঁও আক্রমণ করতে আসে। প্রশাসন বিষয়টি দ্রুত আমলে নেয়, তখন ঝুমন দাশকে স্থানীয় হিন্দু নেতারা ধরে পুলিশে দেন এবং উত্তেজিত হেফাজত সমর্থকদের নিবৃত করতে সমর্থ হন। এরপর হেফাজতের নেতাদের ও হবিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিবেকানন্দ মজুমদারের মধ্যে একটি শান্তি বৈঠক হয়, হেফাজতের নেতারা হামলা না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যায়।

সব কিছুর পরেও বুধবার ১৭ মার্চ ২০২১ সকালে মাইকে ঘোষণা দিয়ে কয়েক হাজার লোককে সংগঠিত করে হামলার পরিকল্পনা করা হয়। শাল্লার হবিপুর ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রাম ও পাশের কাশিপুর নারায়ণবাজার, হবিপুরের মধ্যে ছোট একটি নদী দারাই। ওই নদীর ওপর সাঁকো পার হয়েই নয়াগাঁও গ্রামে আসতে হয়। স্থানীয় ইউপি সদস্য বিশ্বরূপ দাস জানান, হাজার দেড়েক লোক যখন সকালে লাঠি, রামদা নিয়ে আক্রমণের জন্য আসে তা নদীর এপার থেকেই দেখা যায়। তাদের দেখে গ্রামের লোকজন গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। এর মধ্যে নারী ও শিশুদের একটি অংশ পালাতে পারেননি। হামলাকারীদের একটি অংশ সাঁকোর ওপারে অবস্থান করে আর আরেকটি অংশ গ্রামে ঢুকে বাড়ি ঘরে হামলা চালায়। হামলাকারিরা দুইটি দলে ভাগ হয়ে বন্ধ ঘরে ঢুকে ভাঙচুর করে, আলমারি ভেঙে স্বর্ণালঙ্কার, মূল্যবান সামগ্রী ও টাকা পয়সা লুট করে। মোট ৮৮টি ঘরে হামলা চালিয়ে তারা লুটপাট করে। ৭-৮টা পারিবারিক মন্দির ছিলো সেগুলোও ভাঙ্গচুর করে, মন্দিরের প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলে উল্লাস করে তারা। আর যে নারী ও শিশুরা পালাতে পারেনি তাদের মারধর করে।

বিশেষ করে ঝুমন দাসের স্ত্রী ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের স্ত্রীকে ব্যাপক মারধর করে। ইউপি চেয়ারম্যানের স্ত্রী বাথরুমে ঢুকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে তাকে সেখান থেকে টেনে বের করে মারা হয়।

স্থানীয়দের দাবি পুলিশ পুরো ঘটনার পরিকল্পনা আগে থেকেই জানতো। আর ঝুমন দাশ, যাকে নিয়ে উত্তেজনার সূত্রপাত সে তো পুলিশের হেফাজতেই ছিল। তারপরও হামলা ঠেকানো বা গ্রামবাসীর নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা নেয় নি পুলিশ। এমনকি গ্রামে মোতায়েন করা হয়নি পুলিশের কোন দল। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, বুধবার সকালে হামলা শুরুর পর মাত্র ১০-১৫ জন পুলিশ সদস্য ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও হাজার দেড়েক লোকের হামলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না ঐ কয়জন পুলিশের পক্ষে। হামলাকারীরা ঘন্টা দেড়েক পর চলে গেলে পুলিশের বড় দল এসে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পাশের এলাকার আওয়ামী লীগ নেতাদেরও অনুরোধ করা হয়েছিল যেন তারা হামলা থামানোর ব্যবস্থা নেন। আর এই হামলায় নেতৃত্ব দেয় চন্ডীপুরের স্বাধীন মেম্বার, পাক্কন মিয়াসহ আরো অনেকে। তবে স্বাধীন মেম্বার গণমাধ্যমের কাছে অভিযোগ অস্বীকার করেন বার বার। সুনামগঞ্জ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিমল বণিক অভিযোগ করেন, হামলা ঠেকাতে পুলিশ আগাম কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। আগের রাত থেকেই উত্তেজনা চলছিল। পুলিশকে জানানোর পরও পুলিশ ছিল নির্বিকার। মাঠে মাইকে ঘোষণা দিয়ে বুধবার সকালে হামলা চালানো হয়।

শাল্লা থানা ওসি ফেসবুক স্ট্যাটাস দেয়ার ঘটনায় আগের রাতেই হিন্দু যুবককে আটক করার কথা স্বীকার করেন। ওই গ্রামের লোকজনের থানায় যাওয়ার কথাও জানেন তিনি। তারপরও কেন আগাম নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া হলোনা জানতে চাইলে বলেন, হামলা হবে সেটা আমরা ধারণা করতে পারিনি। হামলার দিন সকালেও কেন প্রথমে অল্প সংখ্যক পুলিশ পাঠানো হল তারও কোনো জবাব দিতে পারেননি ওসি। তিনি শুধু বলেন, "যাই হোক এখন পুলিশ আছে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।" কারা এই হামলায় জড়িত তাও তদন্তের আগে বলা যাবে না বলে জানান তিনি।

হামলার শিকার যারা হয়েছেন তাদের জন্য জেলা প্রশাসন সাত মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দিয়েছে। আর কিছু পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে বলে জানানো হয়।

হেফাজতে ইসলামের সাংগঠনিক সম্পাদক ও মুখপাত্র মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী হামলার দায় অস্বীকার করে বলেন, স্থানীয় লোকজন যারা হামলা করেছে তাদের সাথে হেফাজতের কোন সম্পর্ক নেই। এটা হেফাজতকে হেয় করার একটা ষড়যন্ত্র। ইসলামাবাদী আরও বলেন, এই ধরণের হামলাকে হেফাজতে ইসলাম সমর্থন করে না, পুলিশের কাজ হল যারা হামলা করেছে তাদের চিহ্নিত করে আইনের হাতে সোপর্দ করা।

নোয়াগাঁও গ্রামটিতে প্রায় চারশত পরিবার ও দেড় হাজার লোকের বসবাস। পুরো গ্রামটিই হিন্দু অধ্যুষিত। হামলার পর অনেকেই গ্রামে ফিরে আসলেও তাদের সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। হাওড় এলাকার এই গ্রামের মানুষ মূলতঃ মৎসজীবী। আর এক ফসলি জমির ওপর নির্ভর করে তাদের জীবন চলে। ক্ষতিগ্রস্ত ও আতংকিত মানুষের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ এবং র‍্যাবের দুইটি অস্থায়ী ক্যাম্প বসানো হয়েছে ।

হামলার ঘটনার ৩ দিন পর ১৮ মার্চ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুইটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় ৮০ জনের নাম দিয়ে এবং কয়েকশত অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে একটিতে প্রধান আসামী হিসেবে নাম এসেছে শহীদুল ইসলাম স্বাধীনের। শহীদুল ইসলাম স্বাধীন দিরাই উপজেলার একটি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, কিন্তু শাল্লাতে ওই হামলার পর থেকেই তার নামটি সামনে চলে আসে। মৌলভীবাজারের কুলাউড়া থেকে ২০ মার্চ ২০২১ ভোররাতে পিবিআই আটক করে স্বাধীনকে । স্বাধীনের বাড়ি শাল্লার পার্শ্ববর্তী দিরাই উপজেলার নাচনি গ্রামে। তিনি স্থানীয় ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি। স্থানীয়দের অভিযোগ, হামলাকারীদের বেশিরভাগই আসে স্বাধীনের গ্রাম দিরাইয়ের নাচনি থেকে। স্বাধীন মেম্বারও হামলাকারীদের দলে ছিলেন। তার উপস্থিতিতেই হামলা হয়। স্বাধীন মেম্বারের সঙ্গে জলমহাল নিয়ে নোয়াগাঁও গ্রামবাসীর বিরোধ রয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ সেই বিরোধের জেরেই মামুনুল অনুসারীদের সঙ্গে স্বাধীন মেম্বার এই হামলায় অংশ নেন।

-

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

ঢাকার আকাশে মিথেন গ্যাসের অধিক উপস্থিতি: চরম তাপদাহ

- জয়ন্ত কুমার শাওন

ক্রমাগত বায়ুদূষণের মাত্রা বাড়ছেই। বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক শহরগুলোর মধ্যে রাজধানী ঢাকার অবস্থান শীর্ষে। প্রায় প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে নতুন রেকর্ড। গত শীতের পুরোটা সময় জুড়ে ঢাকা শহরের বায়ুতে কুয়াশা কম, বরং অতি ক্ষতিকর ধুলি কণায় ($PM_{2.5}$, PM_{10}) আচ্ছন্ন ছিল বেশি। ২০২১ এর মার্চের শুরু থেকেই বাড়তে থাকে তাপমাত্রা, দিন-রাতের তাপমাত্রায় তেমন তফাৎ পাওয়া যায়নি। প্রায় ১ দশক ধরে গোটা ঢাকা শহর জুড়ে চলেছে ব্যাপক অবকাঠামো নির্মাণের কাজ। আর সেই কারণেই ঢাকার বায়ু সব সময় ধূম্রজালে আচ্ছন্ন থাকছে। তারই সাথে পাল্লা দিয়ে কল-কারখানা, যানবাহন, ইটভাটার কালো ধোঁয়া ও রান্নায় ব্যবহৃত কাঠকয়লার ধোঁয়া যা বায়ু দূষণে বড় ভূমিকা রাখছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান Air Quality Index (AQI) এর প্রতিবেদনে জানা যায়, ২০২১ এর জানুয়ারি মাসের ১ম ও ২য় সপ্তাহে দিনের কোনো না কোনো সময়ে বায়ু দূষণে ১ নম্বরে ছিল ঢাকা। অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গত ১০ জানুয়ারি ২০২১ দূষণের মাত্রা ছিল ৫০২। বায়ু বিশেষজ্ঞদের মতে, সূচক ৩২৬ মানেই দুর্যোগপূর্ণ। তাদের মতে, এখনই দূষণ কমাতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। এর প্রভাব কেবল মানব শরীর বা পরিবেশ নয়, মানুষের গড় আয়ুতেও প্রভাব বিস্তার করছে।

মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান Lawrence Berkeley National Laboratory বলছে, রাসায়নিক মিশ্রণ আছে এমন দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে থাকলে চোখ, নাক বা গলায় সংক্রমণ অথবা ক্ষতির কারণ হতে পারে, সেই সঙ্গে ফুসফুসের নানা জটিলতা যেমন: ব্রংকাইটিস বা নিউমোনিয়া, মাথা ব্যাথা, অ্যাজমা এবং নানাবিধ অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দিতে পারে। বায়ু দূষণের সঙ্গে ডায়াবেটিসের সম্পর্কও দেখতে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রকল্পের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২.৬ বছর। এক বছর আগে একই সময়ে এ গড় আয়ু ছিল ৭২.৩ বছর। তবে বাড়তির দিকে থাকা এই গড় আয়ু বায়ু দূষণ অব্যাহত থাকলে এক লাফে নেমে যেতে পারে ৬৭ বছরে! বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ মানুষ দক্ষিণ এশিয়ার চার দেশ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান

ও নেপালে বসবাস করে। এ চার দেশে বায়ুদূষণের মাত্রাও বেশি। গত এক দশক ধরে ৪৪ শতাংশ বায়ু দূষণ বাড়ায় এ চার দেশের মানুষের গড় আয়ু অন্তত গড়ে পাঁচ বছর কমে যেতে পারে। আর বিশ্বব্যাপী এ গড় আয়ু হ্রাস পেতে পারে কমবেশি তিন বছর। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২৩৪ দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বায়ু দূষণের দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই দূষণের মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহনীয় মাত্রা ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে দূষিত বায়ু ঢাকা এবং খুলনা অঞ্চলে। এ দুই অঞ্চলে বসবাসরত মানুষ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইনের আট গুণ বেশি দূষিত বায়ুতে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন। বিশ্ব জুড়ে বাতাসে পিএম-২.৫ বায়ুকণার ২৫ শতাংশ সরবরাহ করছে যানবাহন। ২০ শতাংশ আসছে কাঠ ও কয়লা পোড়ানোর কারণে। এছাড়া বায়ুতে ১৫ শতাংশ অতি সূক্ষ্ম পদার্থের জন্য দায়ী বিদ্যুৎকেন্দ্র ও অন্যান্য শিল্পকারখানা।

পরিবেশ মন্ত্রণালয় বায়ু দূষণের জন্য ২০টি কারণ চিহ্নিত করেছে। এগুলো হলো ইটভাটা, রাস্তা নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও মেরামত, সেবা সংস্থাগুলোর নির্মাণকাজ ও রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি, বড় উন্নয়ন প্রকল্প (এক্সপ্রেসওয়ে, মেট্রোরেল), সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বহুতল ভবনসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ, সড়ক বা মহাসড়কের পাশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বালু উত্তোলন ও সংগ্রহ, ট্রাক বা লরিতে বালু, মাটি, সিমেন্টসহ অন্য নির্মাণ সামগ্রী উন্মুক্ত অবস্থায় পরিবহন, রাস্তায় গৃহস্থালি ও পৌর বর্জ্য স্তুপাকারে রাখা ও বর্জ্য পোড়ানো, ড্রেন থেকে ময়লা তুলে রাস্তায় ফেলে রাখা, ঝাঁড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করতে গিয়ে ধুলাবালি ছড়ানো, বিভিন্ন সড়কের পাশে থাকা অনাবৃত স্থান, ফুটপাত ও রাস্তার আইল্যান্ডের মধ্যের ভাঙ্গা অংশের মাটি ও ধুলা, ফিটনেসবিহীন পরিবহন থেকে নিঃসৃত ক্ষতিকর ধোঁয়া, বিভিন্ন যানবাহনের চাকায় লেগে থাকা কাদামাটি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কলোনির ময়লা-আবর্জনা পোড়ানো, বিভিন্ন মার্কেট, শপিংমল ও বাণিজ্যিক ভবনের আবর্জনা রাস্তায় ফেলা, ঢাকা শহরের দূষণপ্রবণ এলাকার ধুলা, হাসপাতালের বর্জ্য রাস্তায় ফেলা, অধিক সালফারযুক্ত ডিজেল ব্যবহার এবং জনসচেতনতার অভাব। পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণায় বলা হয়েছে, ঢাকার বায়ু দূষণের জন্য ইটভাটার ধোঁয়া ৫৮ শতাংশ দায়ী। বাকি ৪২ শতাংশের জন্য দায়ী নির্মাণ ও মেরামত কাজের সঙ্গে আসা ধুলা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহন থেকে বের হওয়া ধোঁয়া।

কিন্তু সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেল গত এপ্রিল ২০১৯ এর ১ম সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গণমাধ্যম ব্লুমবার্গ প্রকাশিত 'ঢাকা শহরে উচ্চমাত্রার মিথেন গ্যাসের উপস্থিতির' খবরটি। যাদের সংবাদের তথ্যের উৎস ফ্রান্সের একটি প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠান কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ থেকে সংগৃহীত চিত্র বিশ্লেষণে অভিজ্ঞ। প্রতিষ্ঠানটি ইউরোপিয় ইউনিয়নের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত কোপারনিকাস প্রোগ্রামের অধীনে বিশ্বের কক্ষপথে উক্ষেপিত সেন্টিনেল সিরিজ এর কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ-২ (২০১৫ সালে উক্ষেপিত) ও 5P (২০১৭ সালে উক্ষেপিত)-এর তথ্য বিশ্লেষণে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি। এ দুটি কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহের কাজ হলো বিশ্বের চারপাশে ঘুরে বায়ুমন্ডলে উপস্থিত বিভিন্ন গ্রিন হাউজ গ্যাসের মান পরিমাপ করা। এ দুটি কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ থেকে সংগৃহীত চিত্র ব্যবহার করে ফ্রান্সের তথ্য বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা শহরের চারটি স্থানে উচ্চমাত্রার মিথেন গ্যাসের উপস্থিতি চিহ্নিত করেছে। কম্পিউটার অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখিত দুটি কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ থেকে সংগৃহীত চিত্র বিশ্লেষণ করে প্রায় নির্ভুলভাবে কোনো স্থানের বায়ুমন্ডলে নির্গত মিথেন গ্যাসের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারে। এর প্রধান কারণটি হলো সেন্টিনেল ৫পি কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহটি বিশ্বের একই স্থানের ওপর দিয়ে ভ্রমণ করে সাতদিন পরপর। মহাকাশ বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় রি-ভিজিট টাইম (revisit time)। উপগ্রহটি ২০২০ সালের ১৮ নভেম্বর এবং চলতি বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি ও ৩ মার্চ ঢাকার আলোচ্য স্থানগুলোতে উচ্চমাত্রার মিথেন গ্যাসের উপস্থিতির চিত্র ধারণ করে।

এ সপ্তাহগুলোর আগে কিংবা পরের সপ্তাহে

২৩৪ দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বায়ু দূষণের দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই দূষণের মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহনীয় মাত্রা ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে দূষিত বায়ু ঢাকা এবং খুলনা অঞ্চলে। এ দুই অঞ্চলে বসবাসরত মানুষ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইনের আট গুণ বেশি দূষিত বায়ুতে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন।

যখন কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ দুটি ঢাকা শহরের ওপর দিয়ে অতিক্রম করে তখন ধারণ করা চিত্রে উচ্চমাত্রার মিথেন গ্যাসের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে সাময়িকভাবে কোনো উৎস থেকে মিথেন গ্যাস ছড়িয়ে পড়েছিল ঢাকার ওইসব স্থানে নির্দিষ্ট দিনে কিংবা তার আগের কয়েক দিনে। বছরের যে মাসে উচ্চমাত্রার মিথেন গ্যাসের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে তা ছিল শীতকাল। তখন সূর্যের তীব্রতা থাকে বছরের সর্বনিম্ন। এ সময় ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০ মিটার উচ্চতায় ছড়িয়ে পড়া কোনো গ্যাসীয় পদার্থ বা ধোঁয়া সহজে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। ফলে এ সময়ে বায়ুতে নির্গত গ্যাস দীর্ঘ সময় ধরে উৎসস্থল ও তার আশপাশে জমা হয়।

বায়ুমন্ডলে মিথেন গ্যাসের প্রাকৃতিক প্রধান পাঁচটি উৎস হলো জলাভূমি (Wet Land), ময়লার ভাগাড় (Land Fill), পশু খামার, পানিতে নিমজ্জিত ধানক্ষেত, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা। প্রকৃতপক্ষে জলাভূমিতে জৈব পদার্থ পঁচে মিথেন (CH_4) গ্যাস তৈরি হয়।

কিন্তু মিথেন যখন প্রাকৃতিক জীবাশ্ম থেকে উৎপন্ন না হয়ে খাদ্য বা কৃষি ক্ষেত্র বা কৃষি আবর্জনা থেকে উৎপন্ন হয় তখন মিথেন বাতাসের বাইরের কোন উৎস থেকে কার্বন সংগ্রহ করে। আর এই মিথেন না পুড়ে যদি বাতাসে মিশে যায় তবে তা বায়ু মন্ডলকে একধরণের বদ্ধ পরিমন্ডলে পরিণত করে। যা দীর্ঘ সময় ধরে একই স্থানে আটকে থেকে ভূপৃষ্ঠের তাপ অস্বাভাবিক মাত্রায় বাড়িয়ে দেয় এবং আবহাওয়া পরিবর্তনে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে।

প্যারিসভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ব্লুমবার্গ এর গবেষণায় 'ঢাকা শহরে উচ্চমাত্রার মিথেন গ্যাসের উপস্থিতির' চিত্র উঠে এসেছিল। এ নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হলেও সেসময় এর উৎস শনাক্ত করা যায়নি। অবশেষে সেই উৎসও শনাক্ত করেছে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠান জিএইচজিস্যাট ইনকরপোরেশন। পর্যবেক্ষক এই প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছিল, বাংলাদেশে শক্তিশালী গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে রাজধানী ঢাকার মাতুয়াইল ময়লার ভাগাড়। সেখান থেকে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় চার হাজার কেজি মিথেন গ্যাস নিঃসরিত হচ্ছে। আরও স্পষ্টভাবে বললে ১ লাখ ৯০ হাজার গাড়ি প্রতি ঘণ্টায় পৃথিবীর বায়ুকে যতোটা দূষিত করে, প্রতি ঘণ্টায় ঠিক একই পরিমাণ দূষণ ছড়াচ্ছে মাতুয়াইলের এই ময়লার ভাগাড়টি। বিষয়টি অবশ্য তদন্ত করে দেখার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশের পরিবেশ মন্ত্রণালয়।

মিথেন (CH_4) একটি বর্ণহীন ও গন্ধহীন গ্যাস। গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী গ্যাস মিথেনকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী করা হয়ে থাকে। কারণ পৃথিবীতে আসা সূর্যের তাপ ধরে রাখার মাধ্যমে গ্যাসটি বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। এছাড়া মিথেন এতটাই ক্ষতিকর যে, গত দুই দশকে কার্বন ডাই অক্সাইডের চেয়েও বায়ুমন্ডলের ৮৪ গুণ বেশি ক্ষতি করেছে গ্যাসটি।

এদিকে ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন বিষয়ে মাতুয়াইল পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত থাকার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশের পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়। একইসঙ্গে সমস্যার মাত্রা নির্ধারণের জন্য একটি টেকনিক্যাল কমিটিও গঠন করেছে। মন্ত্রণালয় বলেছে, মাতুয়াইল ময়লার ভাগাড় এলাকা থেকে মিথেন গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা খতিয়ে দেখা এবং তা কমিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা রয়েছে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের তথ্য মতে, মাতুয়াইল ময়লার ভাগাড়টি ১৮১ একর জমি জুড়ে বিস্তৃত এবং সেখানে প্রতিদিন প্রায় ২ হাজার ৫০০ টন বর্জ্য ফেলা হয়। এর মধ্যে জাপানের অর্থায়নে তরল বর্জ্য এবং গ্রিন হাউস গ্যাস ব্যবস্থাপনার কাজ করা হলেও সেখান থেকে কী পরিমাণ মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয় সে সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য নেই।

এর আগে ঢাকার আকাশে মিথেন গ্যাস, বাড়ছে ঝুঁকি; এই শিরোনামে ২০১৮ সালের ১৮ নভেম্বর দৈনিক কালের কণ্ঠে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয় প্রাকৃতিক কোনো উৎস নয়, মানুষের ব্যবহৃত বর্জ্য থেকেই উৎপন্ন হচ্ছে মিথেন গ্যাস, যা ভেসে বেড়াচ্ছে ঢাকার আকাশে। সাধারণ বিবেচনায় কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বিপজ্জনক গ্যাস বলে মনে করা হয়, কিন্তু এই মিথেন গ্যাস ২১ গুণ বেশি বিপজ্জনক।

ঢাকা শহরের জনসংখ্যার ঘনত্ব বাড়ছে। ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৯৯১ সালে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ১৫ হাজার ৩৩৩ জন। সেটি বেড়ে ২০০৪ সালে হয় ১৮ হাজার ৫৫ জন। ২০১১ সালে জনসংখ্যার এই ঘনত্ব আরো বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৩ হাজার ২৯ জনে। ফলে ঢাকা শহরে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ঢাকা শহরে একজন মানুষ গড়ে শূন্য দশমিক ৫৬ কেজি বর্জ্য উৎপাদন করছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ওপর এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কারণ কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর পাশাপাশি মিথেন গ্যাস নিয়েও চিন্তা করতে হবে। যদি এ বিষয়টি উপেক্ষিত হয়, তাহলে আমাদের বড় ধরণের ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হবে। কৃষিপণ্য, তাজা শাকসবজি পঁচে গিয়ে মিথেন গ্যাস তৈরি হয়। এই গ্যাস যদি আমরা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারি, তাহলে অনেক কাজে লাগবে এবং এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মিথেন গ্যাসের নিয়ন্ত্রণের ওপর নজর দেওয়া জরুরি। পরিসংখ্যান বলছে, ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রতিদিন তিন হাজার ৮০০ টন বর্জ্য তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যে ৭০-৮০ শতাংশ অর্গানিক বর্জ্য, সেই হিসাবে প্রায় ছয় হাজার টন অর্গানিক বর্জ্য

তৈরি হচ্ছে।

ঢাকার গাবতলী এলাকায় মিথেন গ্যাসের উপস্থিতির জন্য প্রাথমিক কারণ হিসেবে ঢাকা শহরের সবচেয়ে বড় পশু বেচা-কেনার স্থান গাবতলীর গরুর হাটকে ধারণা করা হয়েছিল। মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণী খাদ্য গ্রহণের পরে হজম প্রক্রিয়ায় পাকস্থলীতে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয় ও পায়ুপথের মাধ্যমে তা বাতাসে নির্গত হয়। দৈহিক গঠন প্রক্রিয়ার কারণে জাবর কাটা পশুর পাকস্থলীতে উৎপাদিত মিথেন গ্যাসের পরিমাণ অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা অনেক বেশি। একটি গরু বছরে গড়ে ২২০ পাউন্ড মিথেন গ্যাস বায়ুমন্ডলে নির্গত করে। খোলা মাঠে বিচরণ করা গরু অপেক্ষা বদ্ধ খামার কিংবা ঘরে লালন-পালন করা গরু বেশি পরিমাণ মিথেন গ্যাস নির্গত করে তাদের খাদ্যের প্রকৃতি ভিন্ন হওয়ার কারণে। গাবতলীর পশুর হাটে স্বল্প স্থানে অনেক বেশি পরিমাণ গরু ছাগল-ভেড়া থেকে অনেক বেশি পরিমাণ মিথেন গ্যাস নির্গত হলেও সে স্থানে যে পরিমাণ মিথেন গ্যাসের ঘনত্ব পরিমাপ করেছে কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ, তা ওই প্রাণীগুলো থেকে নির্গত করা সম্ভব না। একই চিত্রে দেখা যাচ্ছে, আমিন বাজারে অবস্থিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ময়লার ভাগাড়ের আশেপাশে মিথেন গ্যাসের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

মিথেন গ্যাসের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি দেখা গেছে সংসদ ভবন এলাকায়, যার আশপাশে কোনো জলাভূমি বা গরুর হাট অথবা চামড়ার কারখানাও নেই কিংবা পানিতে নিমজ্জিত কোনো ধানক্ষেতও নেই। এ স্থানে মিথেন গ্যাসের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি গবেষকদেরকে বাধ্য করে মিথেন গ্যাসের নতুন কোনো উৎসের সন্ধান করতে। গুগল ম্যাপের সাহায্য নিয়ে দেখা গেল কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ থেকে সংগৃহিত চিত্র যে চারটি স্থানে উচ্চমাত্রার মিথেন গ্যাসের উপস্থিতি নির্দেশ করছে, তার প্রত্যেকটিতে কমপক্ষে একটি করে সিএনজি ফিলিং স্টেশন রয়েছে। আরো নির্দিষ্ট করে দেখা যায় যে, হাজারীবাগ, গাবতলী ও হাতিরঝিলের যে স্থানে সবচেয়ে বেশি ঘনত্বের মিথেন গ্যাসের উপস্থিতি নির্দেশ করছে, ঠিক সে স্থানেই অবস্থিত সিএনজি ফিলিং স্টেশনগুলো। এ সিএনজি ফিলিং স্টেশনগুলো থেকে যে গ্যাস গাড়ির সিলিন্ডারে প্রবেশ করানো হয়, তা মিথেন গ্যাস। হাতিরঝিলের আশপাশে খুবই অল্প দূরত্বে পাঁচটি সিএনজি ফিলিং স্টেশন অবস্থিত। সম্ভবত একাধিক সিএনজি ফিলিং স্টেশন থেকে মিথেন গ্যাস নির্গত হয়েছে, যার কারণে এসব স্থানে ছড়িয়ে পড়া মিথেন গ্যাসের বিস্তৃতি অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়া মিথেন গ্যাসের বিস্তৃতি অপেক্ষা বেশি। অনলাইনে পাওয়া ছবিতে দেখা যাচ্ছে গাবতলীর পশুর হাটের পাশে যে সিএনজি রূপান্তর কারখানা অবস্থিত, তার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সিএনজি সিলিন্ডার, যা থেকে মিথেন গ্যাস খুব সহজেই বাতাসে ছড়িয়ে যেতে পারে।

গবেষকরা নিশ্চিত হতে পেরেছেন যে, ঢাকা শহরের চারটি স্থানে উচ্চমাত্রার মিথেন গ্যাসের উৎস সংশ্লিষ্ট স্থানে অবস্থিত সিএনজি ফিলিং স্টেশনগুলো। বায়ুদূষণের কম্পিউটার মডেল যেমন-'Stochastic Time-Inverted Lagrangian Transport Model' বা (STILTv2.x) মডেল ব্যবহার করে উল্লেখিত প্রত্যেক স্থানে ছড়িয়ে পড়া মিথেন গ্যাসের সম্ভাব্য উৎসস্থল চিহ্নিত করা সম্ভব।

ঢাকা শহরের উচ্চমাত্রার মিথেন গ্যাসের উপস্থিতি পরিবেশের জন্য ব্যাপক ক্ষতিকর (মিথেন গ্যাস, কার্বন ডাই-অক্সাইড অপেক্ষা ২৭ গুণ বেশি শক্তিশালী গ্রিন হাউস গ্যাস) এবং জান ও মালের জন্য হুমকি বিবেচনা করে যথাযথ পর্যবেক্ষণ/অনুসন্ধান করতে হবে। ভবিষ্যতে একই রকম মিথেন গ্যাসের বিস্তার রোধে দ্রুত সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

- জয়ন্ত কুমার শাওন
নাগরিক উদ্যোগ-এর কমিউনিকেশন ও পাবলিকশন ইউনিটে কর্মরত

বাংলাদেশের বাতাস দূষিত, তাই ফ্রান্সে স্থায়ি বসবাসের অনুমতি!

বাংলদেশের বাতাসে বিপজ্জনক মাত্রায় দূষিত- এমন যুক্তি দিয়ে এক বাঙালি অভিবাসীকে ফ্রান্স থেকে বিতাড়নের সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছে ফ্রান্সের একটি আদালত। তাকে দেশটিতে বসবাসের অনুমতি দিয়েছেন বোর্দোর একটি আপিল আদালত। ৪০ বছর বয়সি বাংলাদেশি নাগরিকের নাম প্রকাশ না করে ব্রিটিশ গণমাধ্যম the telegraph জানিয়েছে, ফ্রান্সে এ ধরণের রায় এই প্রথম বলে মনে করেন ঐ ব্যক্তির আইনজীবি। আইনজীবি আদালতকে জানান, তার মক্কেলের অ্যাজমা রোগ আছে এবং তিনি বাংলাদেশে গেলে অকাল মৃত্যুর শঙ্কায় পরতে পারেন। সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, বাংলদেশের বাতাস বিপজ্জনক মাত্রায় দূষণের কারণে বাদির জীবন হুমকিতে পড়তে পারে। বাংলাদেশের দূষিত বাতাস নিয়ে আলোচনা অনেক দিন থেকেই। গত বছর বায়ু দূষণের দিক থেকে বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ে অবস্থান ছিল ১৭৯তম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানের থেকেও প্রায় ৬ গুন বেশি খারাপ দেশের কিছু অঞ্চলের বাতাস।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে কৃষিজমি ও জলাধার রক্ষা

- মো. রফিকুল আলম

আনুমানিক প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে 'বঙ্গজ' নামের এই ব-দ্বীপ আজকের 'বঙ্গদেশ' তথা বাংলাদেশ' নামে পরিচিত। এই বদ্বীপে যারা প্রথম স্থায়ী বসতি স্থাপন শুরু করে, ঐতিহাসিকগণ তাদেরকে 'দ্রাবিড়' নামে আখ্যায়িত করেছেন। এরাই প্রথম এই ব-দ্বীপে কৃষিকাজ শুরু করে। সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের কারণে পরবর্তী সময়ে ভূমি মালিকানার ধরণ পরিবর্তন হয়েছে যা এ রকম; দ্রাবিড় সভ্যতা/যুগ (খৃষ্টপূর্ব ৬০০ পর্যন্ত), আর্য্য যুগ/হিন্দু যুগ (খৃষ্টপূর্ব ৬০০-১২০০ খৃষ্টাব্দ প্রায়), মুসলিম শাসন (১২০৬ প্রায়-১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ), ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যুগ/বৃটিশ যুগ (১৭৫৭-১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ), পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১ খৃষ্টাব্দ) এবং বাংলাদেশ ১৯৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে চলমান।

বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহৎ সচল ব-দ্বীপ অঞ্চল, হাজার বছর ধরে (প্রতি বছর উজান হতে ২.৫ বি.মে.টন) পলিমাটি সঞ্চিত হয়ে পলিদ্বারা গঠিত এ অঞ্চলটি, যার প্রাকৃতিক অনুকূল পরিবেশ ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুসহ জীব বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

প্রকৃতিগত ভাবেই বাংলাদেশের উর্বরতার হার তুলনামূলক অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি বলে এটি কৃষি প্রধান দেশ হিসাবে সুপরিচিত। দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ জীবন ধারণের জন্য প্রধানত: কৃষির উপর নির্ভরশীল। বাৎসরিক জাতীয় আয়ের ৪০ ভাগ আসে কৃষি খাত থেকে। অর্থাৎ ভূমি কেন্দ্রিক আমাদের জীবন, জীবিকা ও সংস্কৃতি এখনো মূলতঃ ভূমিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। ভূমির উপর মালিকানা, ভূমির যথাযথ ব্যবহার, ভূমির উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় কৃষি-অকৃষি জমির পরিমাণ ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩৪ হাজার একর। আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ২ কোটি ১ লক্ষ ৫৭ হাজার একর। মাথাপিছু জমির পরিমাণ .০২ শতাংশেরও কম। খাস জমির পরিমাণ ৩৩ লক্ষ একর। জনসংখ্যার অত্যধিক চাপসহ শিল্প যুগের যান্ত্রিকতা এবং বাণিজ্য ভিত্তিক মানসিকতাসহ দ্রুত নগরায়নের ফলে বর্তমানে চিত্রটি ঠিক এরূপ; বাংলাদেশ উর্বর অথচ ভূমি স্বল্পতার দেশ, যেখানে কৃষির জন্য মাথাপিছু ১২.৫০ শতাশ জমি রয়েছে যার মধ্যে প্রতি বছর ১% কোন না কোন ভাবে কৃষি জমি বিলুপ্ত হচ্ছে। হিসাবটি শুধুমাত্র কৃষির জন্যই নয়

বরং খাদ্য নিরাপত্তার উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।[১] বাংলাদেশ ইনিস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাডিজ (বিআইডিএস), কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (জিকেএফ) এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের গবেষণা পরিষদ (বিইউপি) এর প্রতিবেদন মতে ৬টি বিভাগীয় শহরের ২৪টি গ্রামে পরিচালিত একটি গবেষণা পত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে, সেখানের বার্ষিক গড় হিসাব মতে ০.৫৬% কৃষি জমির মধ্যে ফসল উৎপাদনের হার কমে ০.৮৬% থেকে ১.১৬% হ্রাস পেয়েছে। দেশের উন্নয়ন অগ্রগতির সাথে সাথে দ্রুত নগরায়ন এর জন্য প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের হিসাব মতে সাধারণত বাংলাদেশে প্রতি বছর ৮০ হাজার হেক্টর কৃষি জমির মধ্যে ১% প্রতি বছর অকৃষি জমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।[২] বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ববহ যে, যেখানে মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ ১২.৫ থেকে ১৫ শতাংশ। সাম্প্রতিক সময়ে সম্পন্ন জরিপ মতে, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কৃষি জমিগুলো দ্রুত নগরায়নের ফলে কৃষি জমি হয় বসতবাড়ি কিংবা বাণিজ্যিক কার্যক্রমে পরিণত হচ্ছে।[৩] পরিসংখ্যান মতে ১৪.৪০ মিলিয়ন, যা ২০০৫ সনে প্রায় সমপরিমাণ সংখ্যক (১৪.৪৭ মিলিয়ন), যার ৫৬.৭৪% সমগ্র গ্রামীণ খানাসমূহে গত ১২ বছরে (১৯৯৬-২০০৮) গ্রামীণ জনপদে ১.৭৮ কোটি থেকে ২.৫৪ কোটি যার গড় সংখ্যা ৪২.৫% যারা কৃষি জমিকে বসতবাড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে। এছাড়াও গ্রামীণ সাবেক অবকাঠামোগুলোকে নগরায়নের আদলে প্রস্তুত করতে যে পরিমাণ পাকা বাড়ি প্রস্তুত করেছে তার জন্য প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নের একাধিক ইটের ভাটা গড়ে তোলার মাধ্যমে বিরাট অংশের কৃষি জমি অকৃষি জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে, অপর দিকে গ্রামীণ পর্যায়ে দ্রুত নগরায়নের কারণে বাণিজ্যিক প্রসার বৃদ্ধির ফলে কৃষি জমির বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে সরকার বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে ২০০১ সনে কৃষি জমি সুরক্ষায় বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করেছিল, কিন্তু সে নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় নি। এছাড়াও কৃষি জমি সুরক্ষা আইন ২০১৬ (খসড়া) মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক নীতিগতভাবে

গ্রহণ করা হলেও আজ পর্যন্ত তা রহস্যজনক কারণে আইনী রূপ পায়নি।

'অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্মস এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি)' এর সহযোগিতায় পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে দক্ষিণাঞ্চলে দ্রুত নগরায়ন ও বাণিজ্যিক মনোভাবের কারণে কৃষি জমির প্রতি মানুষের অনীহা ও অবজ্ঞা তৈরি হয়েছে। যার মাধ্যমে কৃষিজমির প্রতি বিশেষ করে অনুপস্থিত ভূমি মালিক কর্তৃক ভূমির সর্বোচ্চ মূল্য প্রাপ্তিতে কৃষি ভূমিগুলোকে বাণিজ্যিক সুবিধার কারণে হস্তান্তর করাই কৃষি জমি দ্রুত অকৃষি জমিতে পরিণত হচ্ছে।[৪] কৃষি জমি ক্রমে বিলুপ্ত হওয়ার ভয়াবহতা নিয়ে সরকারি পর্যায়ের জরিপেও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।[৫] একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, অধিকাংশ ইটের ভাটাগুলো পাশের জমির উপরি মাটি (Top-soil) ব্যবহারের ফলে ঐ জমির উর্বরতা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে, যাকে পুষিয়ে নিতে জমিতে অধিক পরিমাণ রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে হচ্ছে। অধিকাংশ জমির উপরি ভাগের মাটি ভরাট হতে কয়েক বছর লেগে যায়। যার প্রত্যক্ষ প্রভাবে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে, সাথে সাথে পরিবেশের উপরও বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে। কৃষি জমি সুরক্ষায় যদিও সরকারিভাবে বহু ধরণের নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে যেখানে কৃষি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারে খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে কৃষি জমি সুরক্ষায় অনুরূপ জমিতে ওয়ারিসগণের বসত ভিটা নির্মাণ, কৃষি জমিতে কোন ধরণের অবকাঠামো, উন্নয়ন পরিকল্পনা কিংবা তৃণমূলের নগরায়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কৃষি জমিকে বাদ দিয়ে প্রণয়নের ওপর জোর দেয়া হয়েছে।[৬]

ভূমি ও কৃষি জমির অকৃষি জমিতে রূপান্তরের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক আবুল বারাকাত তার একটি গবেষণায় উল্লেখ করেন যে; According to our estimate, agricultural land is being converted at a rate of 0.56% per cent per year. On the basis of this rate of conversion and the country's total cultivated area of all farm households amounting to 7.19 million hectares in 1996, conversion of land amounts to 40,452 hectares per year. Another estimate based on annual per household conversion of land @ 0.0096 acre {(46.25 acres / 600) / 8} and the rural land owning households numbering to 16.01 million or {(17.828 − 1.815 or 10.18% completely landless)} in 1996 annual converted land is estimated to be 62,478 hectares. None of these estimates is close to the previously quoted figure of over 80,000 hectares. Furthermore if the previously quoted figure of 80,000

hectares is taken into account, total converted land in the country comes to 720,000 hectares during the nine year period of 1996 to 2005. But the total cultivated area in rural Bangladesh remains almost the same (17.77 million acres) in both the years of 1996 and 2005 with marginal difference of only 46,000 acres. We may, therefore, conclude that the previous figure of land conversion is an over estimate.[৭]

আরেকটি গবেষণা পত্রে দেখা গেছে গ্রামীণ জনপদে পূর্বে প্রতিটি বাড়ির পার্শ্বে যে ডোবাসমূহ ছিল যেখানে বিভিন্ন ধরণের জিয়ল মাছ (শিং, কৈ, মাগুর, বাইন ইত্যাদি) চাষ করা হতো, তা ভরাট করার ফলে প্রাকৃতিকভাবে যে পুষ্টি পাওয়া যেত তা থেকে জনগোষ্ঠী নিজেরাই বঞ্চিত থাকছে। অপরদিকে বাড়ির পাশের পুকুরগুলোকে বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে, ফলে তা প্রকৃতিতে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করেছে। মূলত কৃষি ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা বলতে বুঝানো হয়েছে হাইব্রিড নির্ভর অধিক পরিমাণ উচ্চ ফলনশীলতাকে। যেখানে খাদ্য নিরাপত্তা, খাদ্যে সার্বভৌমত্ব সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার সাথে অবশ্যই খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও কৃষকের খাদ্য উৎপাদনের সার্বভৌমত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়।

অপরদিকে কৃষি কাজের জন্য যে জলাভূমি প্রয়োজন তা পূর্বে উল্লেখিত বিবিধ কারণে বিলুপ্ত হচ্ছে, পাশাপাশি যে পরিমাণ জলাভূমি অবশিষ্ট তাকে দরিদ্র মানুষের প্রবেশাধিকার নেই বললেই চলে। অধ্যাপক আবুল বারাকাত তার অন্য একটি গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছেন "Economically unjust, socially impoverishing, and ecologically suicidal". In quest of more market participation and profit, commercialization of agriculture and agricultural land intensified transfer of agricultural land and water body to non-agriculture uses. The study assessed loss of agricultural land and water bodies per year (year wise during the last 11 years) due to expansion of commercial activities, commercial cultivation, contract farming, tobacco cultivation, and alike. The highest average amount of loss of cultivable land (3.75 acre) and water body (1.63 acre) per household was found in Narayanganj and Manikganj respectively; in both the districts, the growing prevalence of brickfield has led to indiscriminate use of cultivable land and water body. Households of Satkhira, Barisal and Habiganj experienced a decline in the use of average amount of agricultural land.[৮]

সরকারে উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা ও পরিপত্রসমূহে যদিও ভূমি উন্নয়ন কেন্দ্রিক কিন্তু বাস্তবে ঘটছে ঠিক বিপরীত। সাম্প্রতিক সময়ের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যা অতিদরিদ্রদের দারিদ্র্যতা বিমোচনের একটি কৌশলপন্থা, সে কাজটিও যথাযথ ভাবে পরিচালিত হচ্ছে না, যেখানে নানান অভিযোগ ও ত্রুটিসমূহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।[৯] অনুরূপ সরকারের মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য পিছনের ত্রুটিসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানের উপায় নিয়ে প্রস্তুতকৃত নীতিমালাতে স্পষ্টতই কৃষি খাতকে মাত্র ১৬.৭৫% প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।[১০] যেখানে এখনো দেশটি কৃষি নির্ভর ও তার জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের পরিচিতি কৃষক হিসাবে। সামাজিকভাবে আমাদের গ্রামীণ জীবনে ভূমি সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির প্রতীক। ভূমি গ্রামীণ অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু। ভূমি ও পানি সম্পদ আমাদের অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ। এর সঠিক ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের বিষয়টি আমাদের বেঁচে থাকা ও সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ভূমি কেন্দ্রিক জীবনযাত্রা ও আর্থ-সামাজিক

কাঠামোর মর্যাদার কথা বিবেচনায় নিয়ে আমাদের সামাজিক অগ্রগতির কথা ভাবলে ভূমি ব্যবস্থায় যে স্থবিরতা, অচলাবস্থা, জটিলতা, বৈষম্য ও অনাচার যুগের পর যুগ ধরে চলে আসছে তার অবসান ঘটানোর জন্য বিকল্প নেই। এর জন্য প্রয়োজন ভূমির আমূল সংস্কার। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে বলেছেন, 'ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে ভূমি মালিকানা বিন্যাস, প্রকৃত চাষী ও মালিকের মধ্যে অবস্থিত মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বার্থ বিলোপ, জমির খন্ড-বিখন্ডিতকরণ রোধ করা, সমবায় বা পারিবারিকভাবে চাষাবাদ উৎসাহিত করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বৃটিশ ভারত থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমি ব্যবস্থা ও প্রজাস্বত্ব পরিবর্তনকারী ভূমি সংস্কারমূলক আইনগুলো হল:- (ক). চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন, (খ). বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, এবং (গ). পূর্ববঙ্গীয় জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আমরা বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার আইন ও অধ্যাদেশ এর কথা জানি। ১৯১৪ সালের সিকস্তি ও পয়োস্তি আইন (১৯৫০ সনের মূল ৮৬ ধারাকে কিছুটা রদবদল করে) ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইন (২য় সংশোধন) ২০১৩। ভূমি সংস্কারের অনিবার্য ধারায় আসবে কৃষি কাঠামো ও উৎপাদনের ইতিবাচক সংস্কার।

প্রসঙ্গত বলা ভাল যে, বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসন জটিল ও দুর্নীতিগ্রস্ত। ভূমি প্রশাসন সাধারণত দরিদ্রদের বিপক্ষে কাজ করে। প্রচলিত ভূমি আইনও কার্যত দরিদ্র বিরোধী। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া জটিল, দীর্ঘ মেয়াদী ও ব্যয়বহুল। ফলে দরিদ্র মানুষের পক্ষে ন্যায় বিচার পাওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠে না। অপর দিকে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত থাকার কারণেও অনেক সময় দরিদ্ররা কৃষি জমির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাই ভূমি প্রশাসন, ভূমি আইন ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার সংস্কারের মধ্য দিয়ে দরিদ্ররা উপকৃত হতে পারে।

কৃষি জমি সুরক্ষাসহ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হবে, যার মাধ্যমে দেশ মধ্যম আয়ে উন্নীত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি

হবে বলে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর গঠিত প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনাসহ অন্যান্য পাঁচশালা পরিকল্পনা এবং গত ৪০ বছরে প্রতিটি সরকার ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও বাস্তবে কিছু লোক দেখানো কার্যক্রম ছাড়া বৈপ্লবিক কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। কৃষি জমি সুরক্ষায় আজকে বাংলাদেশে কী ধরণের ভূমি সংস্কার হওয়া প্রয়োজনসহ কৃষি জমি ব্যবহারের আইনসহ উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি জমিকে যে কোন ভাবে অধিগ্রহণ করা বন্ধ করতে হবে, কৃষি জমিতে ইটের ভাটা নির্মাণসহ কৃষি জমির টপ-সয়েল ব্যবহার আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

পাশাপাশি নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো গ্রহণ করতে হবে - (১). গ্রামীণ শক্তি কাঠামোর পরিবর্তন; (২). জমির নতুন সিলিং নির্ধারণ; (৩). সকল অবৈধ বন্দোবস্ত বাতিল; (৪). ভূমি অধিগ্রহণ আইন ১৯৯৪ সহ সকল গণবিরোধী আইন বাতিল; (৫). অনুপস্থিত মালিকানা ও বেআইনি মালিকানা বাতিল; (৬). ভূমি প্রশাসনের সমন্বয় ও আমলাতন্ত্র বিমুখ; (৭). আইনের অসঙ্গতি ও জটিলতা দূর করা; (৮). এক ব্যক্তির এক খতিয়ান বাতিল; (৯). নতুন চরের জমি নতুন ভাবে বন্দোবস্ত; (১০). অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থা; (১১). বর্গা আইন ও চুক্তিভিত্তিক কৃষিসহ বহুজাতিক কোম্পানির দৌরাত্ম্য অবসান; (১২). ভূমি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা; (১৩). ভূ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সম-অধিকার; (১৪). ভূমি আদালত গঠনের মাধ্যমে ভূমি ও কৃষি জমির সুরক্ষার উদ্যোগ নিতে হবে এখনই।

- মোঃ রফিকুল আলম
রীচ টু আনরীচড (রান), বরিশাল- এর নির্বাহী পরিচালক

তথ্যসূত্র: ----------

1. Agriculture Land loss and Food Security in Bangladesh: An Assessment report
2. Planning Commission Report 2009
3. Agricultural Census-2008
4. Increasing Commercialization of Agricultural Land and Contract Farming in Bangladesh: An Alternative Appraisal by Human Development Research Centre; Abul Barkat, G M Suhrawardy & Asmar Osman
5. Case study, carried out in 2004 by Directorate of Land Records and Surveys (DLRS) of the Ministry of Land
6. National Land Use Policy-2001
7. Figures within parentheses indicate the per cent of households who converted agricultural land to non-agricultural uses in each residence category.
8. Loss of Agricultural Land and Water bodies- Abul Barakat
9. Social Safety Net Programmes in Bangladesh (SSNP): A Review, BARKAT-E-KHUDA* Bangladesh Development Studies, Vol. XXXIV, June 2011, No- 2
10. National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh, General Economics Division, Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh

-

আইনের ফাঁকফোকর না প্রয়োগগত সমস্যা: একটি বিশ্লেষণ

- এডভোকেট আলেয়া বেগম

বাংলাদেশে 'আইনের ফাঁকফোকর' শব্দটি একটি প্রবাদে পরিণত হয়েছে। আইনের ফাঁক বলে এ দেশে অপরাধীরা প্রায়শই ছাড়া পেয়ে যায় বলে অভিযোগ আছে। এছাড়া বিনা বিচারে, বিনা অপরাধে জেল খাটারও অভিযোগ আছে বিস্তর। এক্ষেত্রে মূল সমস্যাটা কোথায়? আমরা জানি যে, বাংলাদেশে মোটা দাগে ফৌজদারী ও দেওয়ানি- এই দুই ধরণের আইনের অধীনে বিচারিক প্রক্রিয়া আবর্তিত হয়। ফৌজদারি আইনে অপরাধজনিত (ক্রিমিনাল নেচার) অভিযোগের বিচার এবং দেওয়ানি আইনের মাধ্যমে অধিকার বা সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা হয়। আরো সহজভাবে বলতে গেলে সাধারণভাবে হত্যা, সন্ত্রাস, হত্যাচেষ্টা, ধর্ষণ এই ধরণের অপরাধের মামলা হয় ফৌজদারি আইনে। আর প্রধানত জমি-জমা, সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের মামলা ইত্যাদি হয় দেওয়ানি আইনে। এই দু'ধরণের আইনের মামলা তদন্ত, পরিচালনা আর বিচারের জন্য আছে আরো অনেক আইন। সিভিল প্রসিডিউর কোড এবং ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড ছাড়াও সাক্ষ্য আইন এখানে মূল ভূমিকা পালন করে।

ফৌজদারি আইনের দর্শন হলো- এই আইনের অধীনে কোনো মামলা হলে তা সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে শতভাগ প্রমাণ করতে হয়। কোনো সন্দেহ রেখে কাউকে শাস্তি দেয়া যায় না। আসামিরা সব সময়ই 'বেনিফিট অফ ডাউট' এর সুযোগ পেয়ে থাকেন। কারণ, এই আইনে কোনো আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। তাই ন্যূনতম সন্দেহ রেখেও কাউকে যাবজ্জীবন বা মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায় না। এখানে অপরাধ প্রমাণ মানে শতভাগ প্রমাণ। অন্যদিকে দেওয়ানি মামলায় যেহেতু শাস্তি নয়, অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়, তাই কোনো পক্ষ তার দাবি শতকরা ৫০ ভাগের বেশি প্রমাণ করতে পারলেই তাঁর পক্ষে রায় পাবে।

বাংলাদেশে আইনের ফাঁকফোকর ব্যবহার করে ন্যায়বিচারকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে দেওয়ানির চেয়ে ফৌজদারী আইনেই বেশি হয়ে থাকে। এর একটি কারণ হলো ফৌজদারি আইনে মামলা দায়ের, তদন্ত, বিচার এবং রায় কার্যকর পর্যন্ত অনেকগুলো ধাপ পেরোতে হয়। মামলা দায়ের, তদন্ত এবং অভিযোগপত্র (চার্জশিট)- এই তিনটি স্তর সঠিকভাবে সম্পন্ন হলেই কেবল পরবর্তীতে ন্যায়বিচার আশা করা যায়। যদি শুরুতেই গলদ থাকে তাহলে ন্যায়বিচার বাধাগ্রস্ত হতে পারে। ন্যায়বিচার শুধু মামলার বাদীর একার নয়, ন্যায়বিচার আসামির জন্যও প্রযোজ্য। তাই শুধু আইন-আদালত নয়, তদন্তকারী ব্যক্তি/সংস্থারও ন্যায়বিচার নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আইন প্রয়োগ এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায়ই আসলে আইনের চরিত্রকে প্রকাশ করে। আইনের ফাঁকফোকর, অপপ্রয়োগ, প্রয়োগ না হওয়া কতগুলো সংস্থা বা বিভাগের ওপর নির্ভরশীল। এসব সংস্থা বা বিভাগ সঠিকভাবে কাজ না করলে নাগরিকের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি কঠিন হয়ে পড়ে। বিনা দোষে কারাবাস বা আইনের ফাঁকফোকর বলে অভিযুক্তদের রেহাই পাওয়া - এ রকম খবর তখন প্রায়ই সংবাদপত্রে উঠে আসে।

'দণ্ডিত মিয়া, জেলে হাওলাদার', 'দণ্ডিত আশরাফ, ৪ মাস জেল খাটলেন মিন্টু' অথবা সাজা হয় কুলসুমার, জেল খাটছেন মিনু' - গত কয়েকমাসে এরকম অনেক ঘটনা একের পর এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে আইনের অপপ্রয়োগের বিষয়টি সামনে উঠে আসে।

গত ৬ মার্চ ২০২১ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় "দন্ডিত মিয়া, জেলে হাওলাদার" শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় নামের মিল থাকায় একজনের বদলে আরেকজন জেল খাটছেন। এই দুইজন ব্যক্তির নামই মানিক। একজনের নামের শেষাংশ মিয়া, অন্যজনের হাওলাদার। দুইজনের বাড়ী শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার সখীপুর ইউনিয়নে। ২০০৯ সালে সিরাজগঞ্জে র‍্যাবের এক অভিযানে মাদকসহ ৪ ব্যক্তিকে আটক করা হয় যার একজন মানিক মিয়া। গ্রেফতারের কিছুদিন পর তিনি জামিনে মুক্তি পান। ২০১৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জের বিশেষ ট্রাইবুন্যাল-১ অভিযুক্তদের ৪ বছর করে কারাদণ্ড প্রদান করে। একই বছরের ২৩ অক্টোবর সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী মোঃ মানিক মিয়া, পিতা নজরুল হাওলাদার নামে একটি গ্রেফতারী পরোয়ানা শরীয়তপুর জেলার সখীপুর থানায় আসে। আর এর প্রেক্ষিতে ২৮ নভেম্বর ২০১৯ পুলিশ অভিযুক্ত মানিক মিয়ার পরিবর্তে মানিক হাওলাদারকে গ্রেফতার করে। মানিক হাওলাদারের মুক্তির জন্য তাঁর স্ত্রী সালমা বেগম ২ মার্চ ২০২০ হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে বিচারপতি জে বি এম হাসান ও মোঃ খায়রুল আলমের হাইকোর্ট বেঞ্চে শুনানি হয়। আদালত প্রকৃত নাম পরিচয় যাচাই ছাড়া এই মামলায় মানিক হাওলাদেরকে আটক ও কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত হবেনা তা রুলে জানতে চেয়েছে। এছাড়া শরীতপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে বিচারিক অনুসন্ধানের নির্দেশ দেয় আদালত।

একজনের অপরাধে অন্যজনের জেল খাটার ঘটনার আরো বেশ কয়েকটি ঘটনা উঠে আসে গণমাধ্যমে। ২০২০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর যশোরের আদালত চেক জালিয়াতির মামলায় আশরাফ আলী নামে এক ব্যবসায়ীকে এক বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেন। এরপর থেকে আশরাফ পলাতক আসামি। কিন্তু পুলিশ মিন্টু মোল্লা নামের আরেকজনকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়। দুজনেরই বাবার নামই মোহর আলী। শুধু বাবার নামের মিল থাকায় পুলিশ আসামি আশরাফের বদলে মিন্টু মোল্লাকে গ্রেফতার করে। তাঁদের পেশাও ভিন্ন। আশরাফ ব্যবসায়ী আর মিন্টু মোল্লা গাছ কাটার শ্রমিক। মিন্টু এলাকায় নিরীহ হিসেবে পরিচিত। অবশেষে আদালতের নির্দেশে কারাগার থেকে মুক্তি পান মিন্টু মোল্লা। ৩ মাস ২৫ দিন পর যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি মুক্তি পান। মুক্তির পর মিন্টু বলেন, ২০২০ সালের ১৬ নভেম্বর রাত ১০টার দিকে স্থানীয় চৌকিদার কালা কবিরকে নিয়ে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে যান বেনাপোল বন্দর থানার এসআই শফি আহমেদ। এ সময় তিনি তাঁকে এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত দীঘিরপাড় এলাকার মৃত মোহর আলীর ছেলে আশরাফ আলী নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়া আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানার কপি দেখান। মিন্টু মোল্লা এ ধরণের কোন মামলায় তিনি জড়িত নন জানানোর পরও কোন যাচাই বাচাই না করে শুধু বাবার নামের সাথে মিল থাকায় পুলিশ আশরাফ আলী বলে তাঁকে আটক করে নিয়ে যায়।

একজনের বদলে আরেকজনের সাজা খাটার আরেকটি ঘটনা বিচারিক প্রক্রিয়াকে ব্যপক সমালোচনার সম্মুখীন করে। গত ২৩ মার্চ ২০২১ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় "সাজা হয় কুলসুমার, জেল খাটছেন মিনু" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি করে। ২০০৬ সালে কোহিনুর বেগম নামে একজন পোশাক কর্মীকে হত্যার দায়ে কুলসুমা আক্তারকে ২০১৭ সালে ৩০ নভেম্বর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করে চট্টগ্রামের একটি আদালত। প্রতিবেদনে উঠে আসে প্রকৃত আসামী কুলসুমা ২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ২ বছর সাজা খেটে জামিনে বেরিয়ে আসে। মিনু আক্তারের পরিচিত একজন নারী টাকার লোভ দেখিয়ে তাকে কুলসুমার পরিবর্তে সাজা খাটতে রাজী করান। ২০১৮ সালের ১২ জুন কুলসুমা সেজে মিনু আক্তার আদালতে আত্মসমর্পণ করলে কারাগারে পাঠানো হয়। এরপর থেকেই মিনু আক্তার কারাভোগ করছিলেন। গত ১৮ মার্চ চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার মো. শফিকুল ইসলাম খান নারী ওয়ার্ড পরিদর্শকালে মিনু কোনো মামলার আসামি নন বলে জানান। এরপর কারা রেজিস্ট্রারে কুলসুমার ছবির সাথে মিনুর ছবির অমিল ধরা পড়লে পুরো বিষয়টি বেরিয়ে আসে এবং কারা কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে মিনু আক্তারের সাজাভোগের বিষয়টি আদালতের নজরে আনেন।

নিরাপরাধের সাজাভোগ- এটি আইনের ফাঁকফোকর নয়, আইনের অপব্যবহার বা আইন মানা হয়নি। 'আইন যাঁরা প্রয়োগ করেন তাদের ওপরই আইনের যথার্থতা নির্ভর করে। আইনের উদ্দেশ্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। তবে সময়ের প্রেক্ষিতে আইন অনেক সময় যুগোপযোগি নাও হতে পারে যেটিকে আইনের ত্রুটি হিসেবে অনেক সময় দেখা হয়। আইনেরও অপব্যবহারও হতে পারে। আবার আইনের প্রয়োগ নাও হতে পারে। এমনকি আইন নিবর্তনমূলক হতে পারে। ফলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে তাতে মনে হতে পারে যে, আইনে ফাঁকফোকর আছে।

৫৪ ধারা একটি নিবর্তনমূল আইন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ ক্ষমতা আইনও তেমন। কিন্তু এর সঠিক ব্যবহার হলে কিন্তু তা নাগরিকদের কল্যাণেই আসে। তাই উচ্চ আদালত এই আইনের ব্যাপারেও কিছু নির্দেশনা দিয়েছে যাতে বিনা অপরাধে, বিনা বিচারে বা বিনা মামলায় আটক রাখা না যায়।

বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় চারটি পক্ষ কাজ করে। পুলিশ, রাষ্ট্রপক্ষ, আদালত এবং কারা কর্তৃপক্ষ। এখন যে কোনো এক পক্ষের অদক্ষতা বা অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে আইনের অপপ্রয়োগ হতে পারে। অপরাধী ছাড় পেয়ে যাতে পারে। আবার নিরাপরাধ কেউ শাস্তি পেয়ে কারাগারে যেতে পারে।

নিম্ন আদালতের মামলা পর্যালোচনা করেও দেখা গেছে যে সর্বোচ্চ ১৫-২০ ভাগ মামলায় আসামিদের শাস্তি নিশ্চিত করা হয়, আর ৮০ ভাগ মামলায়ই আসামিরা খালাস পেয়ে যান। এর পেছনে নানা কারণ আছে। কিন্তু প্রধান কারণ হলো তদন্তের দুর্বলতা। ২০১২ সালে হরতাল চলাকালীন পুরনো ঢাকায় প্রতিপক্ষভেবে বিশ্বজিৎকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা মামলার রায়ে আদালত তা বলেছে। এটা ইচ্ছা করে হতে পারে, আবার অদক্ষতার কারণেও হতে পারে। বিশ্বজিৎ হত্যা মামলার ময়নাতদন্তেও অসততার কথা বলেছে আদালত।

বাংলাদেশে আইনে যেমন ত্রুটি আছে, আছে সাক্ষ্য আইনে দুর্বলতাও। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ধর্ষণের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। আর সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ আইনে শাস্তি দিতে হলে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ও পারিপার্শ্বিক সাক্ষীকে আদালতে হাজির করতে হয়। প্রয়োজন হয় চিকিৎসা সংক্রান্ত সনদসহ অন্যান্য দালিলিক সাক্ষ্য। সঠিক সময় ডাক্তারি পরীক্ষা করা না

হলে ধর্ষণের আলামত পাওয়া যায় না। বহুল আলোচিত ঢাকার বনানি ধর্ষণ মামলা যার প্রমাণ। এছাড়াও আদালতে ধর্ষণের শিকার নারীকেই ধর্ষণের ঘটনা প্রমাণ করতে হয়, যা একটি কঠিন এবং জটিল প্রক্রিয়া। ফলে ধর্ষণের শাস্তি অনেকক্ষেত্রেই নিশ্চিত করা যায় না।

২০১৩ সালে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু নিবারণ আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড। নির্যাতনের কারণে পুলিশী হেফাজতে মৃত্যু হলে দায়ীকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া যাবে। শুধু নির্যাতনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে নির্যাতনের মাত্রা বিবেচনায় বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু আইনে বলা হয়েছে, সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা এক লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাবে। ফলে অপরাধী শুধু জরিমানা দিয়েই মুক্তি পেতে পারেন।

আবার অস্ত্র এবং মাদক আইনের মামলায় অপরাধ প্রমাণ করতে হলে কোনো ব্যক্তির দখলে ওই অস্ত্র বা মাদক পাওয়া জরুরি। কেউ ওই অপরাধে জড়িত হওয়ার পরও তাদের কাছে বা দখলে অস্ত্র বা মাদক না পাওয়া গেলে তারা আইনে সুবিধা পান এবং অপরাধ প্রমাণ করা কঠিন হয়। আবার আইনের বিধানের কারণেই কারো পকেটে অস্ত্র বা মাদক দিয়ে তাকে মিথ্যা মামলায় ফাসিয়ে দেয়া যায়।

যৌতুক বিরোধী আইনে যৌতুক বলতে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে দেয়া যে কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতকে বোঝাবে। তবে কোনো উপঢৌকন যৌতুক হিসেবে গণ্য হবে না। আর এই উপঢৌকনের আড়ালেই চলছে যৌতুক দেয়া নেয়া।

মানহানির একই অপরাধে বাংলাদেশে দুই ধরণের আইন আছে। পত্রিকা বা বইয়ে লিখে কারোর মানহানি করলে তার শাস্তি ৫০০ ধারায় দুই বছরের জেল। এই একই অপরাধ অনলাইন বা ইলেকট্রনিক বিন্যাসে করলে তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধরায় ১৪ বছরের জেল। ৫৭ ধারায় কারোর অনুভূতিতে আঘাত লাগলেই তিনি মামলা করতে পারেন। এই অনুভূতির কোনো ব্যাখ্যা না থাকায় এই আইন দিয়ে হয়রানি ও মিথ্যা মামলা দেয়া যায়। 'কেউ যদি সঠিক তথ্য প্রমাণসহ কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ধরেন তাহলেও তার বিরুদ্ধে মামলা করা যায়। আর যে কোনো ঘটনায় মিথ্যা মামলার সুযোগ তো আছেই। জামিন অযোগ্য মামলায়ও বিচারক যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে জামিন দিতে পারেন। এখন প্রশ্ন হলো, বিচারক তথ্য প্রমাণসহ যৌক্তিক কারণে কি সব সময় সন্তুষ্ট হন?

বাংলাদেশে রাষ্ট্রদ্রোহ ও আদালত অবমাননার বিষয়টিও আইনে অস্পষ্ট। এখানে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার অধিকাংশ মামলাই হয় সরকার বিরোধিতা বা সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করলে। সরকারের বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনামূলক কথাও রাষ্ট্রদ্রোহের পর্যায়ে ফেলে দেয়া হয়। কোনো বিচারকের বিরুদ্ধে সঠিক তথ্য প্রমাণসহ কিছু লিখলে বা বললেও। কোনো রায়ের সমালোচনা করলেও তা আদালত অবমাননা হিসেবে দেখার প্রবণতা রয়েছে। তাছাড়া সাক্ষ্য আইনের দুর্বলতা অথবা সুনির্দিষ্টতার কারণে কোনো হত্যাকান্ড বা নেপথ্যে ইন্ধনদাতার অপরাধ প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব।

আইনের বেসিক প্রিন্সিপল হলো উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সমঝোতা রক্ষা করা। এখন ফৌজদারি আইনে ১০০ টাকাও চুরি আবার ১০০ কোটি টাকাও চুরি। ১০০ টাকা চুরি করলে জেলে যাবেন আর ১০০ কোটি টাকা চুরি করলে ভিআইপি স্ট্যাটাস পাবেন। এই পাবলিক পারসেপশন থেকে আইনের ফাঁকফোকরের কথা বলা হয়। মনে করা হয় আইনে কোথাও ফাঁকফোকর আছে। আসলে এটা আইনের প্রয়োগগত সমস্যা। বৃটিশরা এই আইন যখন করে তখন চুরির শাস্তি দেয়ার চেয়ে চোর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা ছিল বেশি। ১৮ শতকের বৃটিশ আইনকেই আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মীকরণ করেছি। কিন্তু সেই আইন দিয়ে আজকের সময়ের মানুষের মর্যাদা, মনন কোনোটাই ধারণ করা সম্ভব নয়।

আমরা এখন বলি আইনের শাসন না থাকলে এটা থাকবে না, ওটা থাকবে না। কিন্তু এই আইনের শাসন হলো একটা অলীক আশ্বাসের জায়গা। কারণ যে ঔপনিবেশিক আইন হয়েছে আপনাকে-আমাকে দমন-পীড়নের জন্য, সেই আইনগুলো বহাল থাকলে আপনার-আমার সম্মান, ন্যায়বিচার, মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে না। সেজন্য নতুন 'সেট অফ ল'-এর প্রয়োজন। এছাড়া একই অপরাধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইন ও সাজার বিধানসহ আইনে অনেক 'কন্ট্রাডিকশন' আছে, যা দূর করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সরকার সর্বতোভাবে আইনের সুশাসন ও আইনের সঠিক প্রায়োগিক দিক ঠিক রেখে জনগণের কাছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধার করলে বিনা অপরাধে কেউকে সাজা ভোগ করতে হবে না।

- এডভোকেট আলেয়া বেগম

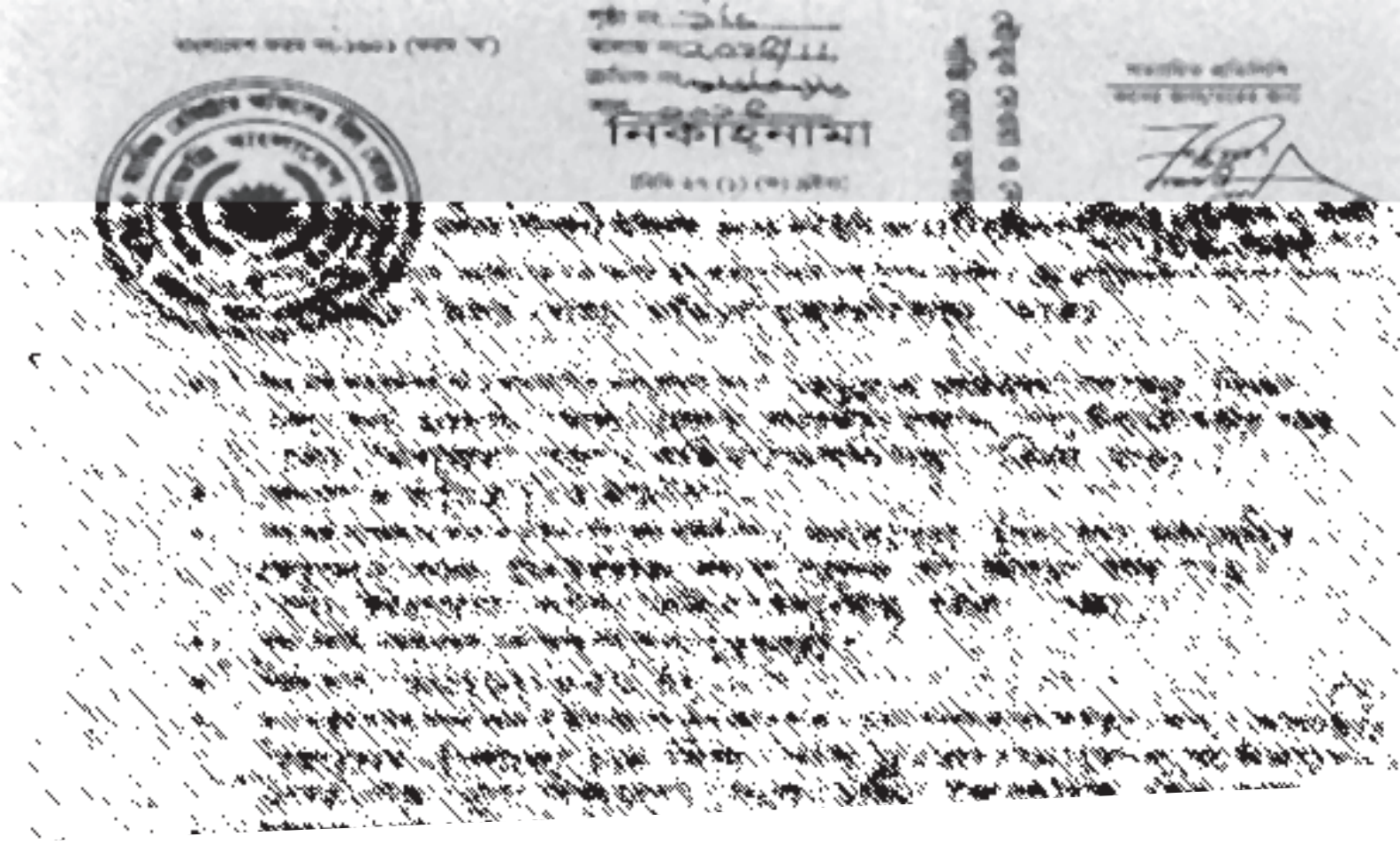

নারীদের নিকাহ রেজিস্ট্রার হতে বাধা কোথায়?

- নাগরিক উদ্যোগ ডেস্ক প্রতিবেদন

নাগরিক উদ্যোগ- এ কর্মসূচি কর্মকর্তা (আইনগত সহায়তা ও প্রশিক্ষণ) হিসেবে কর্মরত।

'নারীদের নিকাহ রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়' শিরোনামে ১০ জানুয়ারি ২০২১ বিভিন্ন পত্রিকায় সংবাদ প্রচারিত হয় যেখানে দেখা যায় **বাংলা**দেশের সামাজিক ও বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নারীরা নিকাহ রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করতে পারবে না এই মর্মে নির্দেশনা দেওয়া হাইকোর্টের রায় প্রকাশিত হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বহাল থাকার ফলে নারীদের দিয়ে নিকাহ রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন দেশের বিজ্ঞ আইনজীবীরা। ২০২০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ সংক্রান্ত রায় দেন। ১০ জানুয়ারি ২০২১ এমন সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জের রিটে জারি করা রুল খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। এ রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি পাওয়ার কথা জানিয়েছেন রিট আবেদনকারীর আইনজীবী মো. হুমায়ুন কবির। তিনি জানান, ২০১৪ সালে দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়িয়া পৌরসভার ৭, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে আয়েশা সিদ্দিকাসহ তিনজন নারীর নামের একটি তালিকা আইন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়। কিন্তু আইন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ওই প্রস্তাব বাতিল করে দেয়।

এমতাবস্থায় একই সালে আইন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন করেন উক্ত তালিকার এক নম্বরে থাকা আয়েশা সিদ্দিকা। ওই রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট রুল জারি করেন। ওই রুলের ওপর চূড়ান্ত শুনানি শেষে তা খারিজ করে দেন হাইকোর্ট। রায়ে বলা হয়, বর্তমানে একটি ট্রেন্ড হলো স্থানীয় মসজিদে নিকাহ সম্পন্ন করা। মাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ মাসিক হওয়ার কারণে একজন নারী মসজিদে প্রবেশ করতে পারেন না। এমনকি ওই সময়ে বাধ্যতামূলক দৈনন্দিন প্রার্থনা থেকেও তাদের রেহাই দেওয়া হয়েছে। এই শারীরিক ডিসকোয়ালিফিকেশন (নির্দিষ্ট সময়) তাকে ধর্মীয় কাজের অনুমতি দেয় না। কারণ মুসলিমদের বিয়ে একটি ধর্মীয় আচার। রায়ে আরও বলা হয়, এখানে বিতর্ক নেই যে, আমাদের সংবিধান নারী ও পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, অন্য পাবলিক অফিসে নারীরা যে ধরণের কাজ করেন, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার হিসেবে কার্যক্রমটা সম্পূর্ণ আলাদা। এসব পর্যবেক্ষণ দিয়ে হাইকোর্ট ২০১৪ সালের ১৬ জুনের আইন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ না করে রুল খারিজ করে দেন বলে জানান আইনজীবী। তিনি বলেন, এ রায়ের ফলে নারীদের নিকাহ রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়।

কিন্ত এই সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ আয়েশা সিদ্দীকা। ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন বিয়ের অনুষ্ঠানে কাজীদের বিয়ে পড়াতে দেখে আয়েশা সিদ্দিকার স্বপ্ন একদিন সেও এমন

কাজ করব এবং দেশের প্রথম নারী কাজী হবে। বড় হওয়ার পর তিনি দেখলেন, মেয়েরা নিকাহ রেজিস্ট্রার হতে পারবে না এমন কথা কোথাও লেখা নেই। আয়েশা সিদ্দিকার বয়স এখন ৩৯ বছর। তিনি স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্য নিয়েই ফুলবাড়িয়া পৌরসভার ৭, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রারের লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেন। এছাড়া তিনি ফুলবাড়ীর দারুল সুন্নাহ সিনিয়র সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পাশ করেন।

নিকাহ রেজিস্ট্রারের লাইসেন্সের জন্য আবেদন করার পর যাচাই বাছাই শেষে লাইসেন্স মঞ্জুরির স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটি ২০১৪ সালে তিন জনের নাম আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। তার মধ্যে আয়েশা সিদ্দিকার নামও ছিল। কিন্তু আইন মন্ত্রণালয় নারী বলে আয়েশা সিদ্দিকাকে রেজিস্ট্রারের লাইসেন্স দিতে অপরাগতা জানায়। কিন্তু আয়েশা থেমে যাননি। তিনি নিকাহ রেজিস্ট্রার হওয়ার লড়াই চালিয়ে যান। এজন্য তিনি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় আইন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে তিনি হাইকোর্টে রিট আবেদন করলে ২০২০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তার আবেদন খারিজ করে দেয় হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ। সেই পূর্ণাঙ্গ রায় সম্প্রতি প্রকাশিত হলে বিষয়টি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়। আয়েশা সিদ্দিকা জানান, আইন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা বিধিমালায় কোথাও বলা হয়নি যে কেবল পুরুষেরাই নিকাহ রেজিস্ট্রার হতে পারবে। সেখানে যেসব যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে, তার সবগুলোই তার আছে। তাছাড়া বাংলাদেশের সংবিধানেই নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। নিকাহ রেজিস্ট্রার কোনো সরকারি পদ নয়। একটি এলাকার জন্য একজন কাজি বা নিবন্ধক থাকেন, যিনি সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়ে নির্ধারিত পারিশ্রমিকে কাজটি করেন। নিকাহ রেজিস্ট্রার হতে হলে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা মাদ্রাসা বোর্ডের নিবন্ধিত মাদ্রাসা থেকে কমপক্ষে আলিম পাশ হতে হবে। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তিনি যে এলাকার কাজি বা নিকাহ রেজিস্ট্রার হতে চান, সেখানকার বাসিন্দা হতে হবে। আয়েশা সিদ্দিকার এসব যোগ্যতা থাকার পরও কেন তিনি কাজি হতে পারবেন না? ২০১৪ সালে আয়েশার লাইসেন্সের আবেদন আইন মন্ত্রণালয় খারিজ করে দিয়ে বলেছে, 'বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের দ্বারা নিকাহ রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।' আইন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে আয়েশা হাইকোর্টে রিট আবেদন করলে আদালত রুল জারি করলেও সেই রুল খারিজ হয়ে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তই বহাল থাকে।

বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী ও বিচারপতি কাজি জিনাত হকের হাইকোর্ট বেঞ্চের দেওয়া পূর্ণাঙ্গ রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, প্রাথমিকভাবে দুজন মুসলিম যুগলের মধ্যে বিয়ে পড়ানোই একজন নিকাহ নিবন্ধকের কাজ, যা মূলত একটি ধর্মীয় আচার। শহরাঞ্চলে পর্যাপ্ত উন্মুক্ত স্থান না থাকায় মসজিদে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, শারীরিক কিছু পরিস্থিতির কারণে একজন নারীর পক্ষে মাসের কোনো একটা সময় মসজিদে যাওয়া সম্ভব হয় না। ঐ সময় একজন নারী বাধ্যতামূলক দৈনন্দিন প্রার্থনা থেকেও বিরত থাকেন। ফলে 'নারীদের নিকাহ রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়'।

আয়েশার এই লড়াই শুধু নারীদের নিকাহ রেজিস্ট্রার হওয়ার লড়াই নয়, এর সাথে যুক্ত আছে নারী-পুরুষ সম অধিকারের লড়াই। এই রাষ্ট্র সংবিধানে নারীদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সম অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতার কথা বলে। অথচ নারীকে নিকাহ রেজিস্ট্রারের স্বীকৃতি না দেয়া স্পষ্টতই রাষ্ট্রের নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রকাশ। মুসলিম অধ্যুষিত দেশ মিশরেই নারী নিকাহ রেজিস্ট্রার স্বীকৃত। কিন্ত আমাদের দেশে এখনও মাসিক নিয়ে 'ট্যাবু' কাজ করে, তার থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারছি না। বিশ্বের অনেক দেশেই মসজিদে মেয়েরা নামাজ পড়ে, ঈদের জামায়াতে যায়, বিশ্বের অনেক দেশের মসজিদে নারীরা ইমামের কাজ করে কিন্তু আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কোনভাবেই বদলাতে পারছি না। দেশে নারীরা যুক্ত আছে নানান দায়িত্বে, তবে কেন পারবে না নিকাহ রেজিস্ট্রার হতে। মাসিক? রাতে বিয়ে? মসজিদে বিয়ে? এই দুর্বল যুক্তি বাস্তব সম্মত নয়। তাই নতুন করে বিবেচনা করতে হবে বিষয়টি নিয়ে। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক এই দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে কারণ নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হবে মানবিক সমাজ।

করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সচেতনতা জরুরি!

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।

ঘরের বাইরে মাস্ক ব্যবহার করুন।

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)

জ্বর-কাশি হলেই আতঙ্কিত হবেন না। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে অন্যান্য ভাইরাসজনিত জ্বরের মতোই একই রকম উপসর্গ দেখা দেয়। করোনা ভাইরাস মূলতঃ ফুসফুসে আক্রমন করে, জ্বরের সাথে শুকনো কাশি শুরু হয় এবং এক সপ্তাহের মধ্যে শ্বাসকষ্ট অনুভূত হয়। এসব লক্ষণ মারাত্মক হলে, রোগীকে হাসপাতালে নিতে হবে, অন্যথায় বাড়িতেই চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। এই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে ১৪ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের শতকরা ৮১ ভাগের প্রথমে শরীরে হালকা লক্ষণ দেখা দেয়, যা অন্যান্য ভাইরাস জ্বরের মতই চিকিৎসায় ভাল হয়। শতকরা ১৪ ভাগের শরীরে মাঝারি লক্ষণ এবং ৫ শতাংশ মানুষ গুরুতর অসুস্থ হয়। যারা বয়স্ক, যাদের কিডনীজনিত রোগ, হৃদরোগ, ফুসফুসজনিত রোগ, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ আছে তাদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত বেশি।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয়

ভাইরাস সুরক্ষায় ব্যক্তিগত সচেতনতার কোন বিকল্প নেই। তাই কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে হলে সাবান দিয়ে বারবার হাত পরিস্কার করতে হবে, হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে নাক মুখ ঢেকে ফেলতে হবে এবং হাঁচি-কাশি দেওয়ার পরপরই হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। নাকে-মুখে-চোখে হাত দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। হাঁচি-কাশি বা জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির কাছাকাছি যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রতিরোধে সুনির্দিষ্টভাবে যা করতে হবে

- নিয়মিত জীবাণুনাশক ও সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিন।
- একজন ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি কমপক্ষে ৩ ফুট (দুই হাত) দূরত্ব বজায় রাখুন।
- হাত সাবান দিয়ে না ধুয়ে চোখ, নাক ও মুখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন।
- যেখানে সেখানে থুথু ফেলবেন না।
- বাসা বা বাড়ির বাইরে থেকে এসে গোসল করুন এবং ব্যবহৃত কাপড় ধুয়ে ফেলুন।
- বাড়ি, ঘর ও কর্মক্ষেত্র নিয়মিত পরিষ্কার করুন।
- হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় রুমাল, টিস্যু বা হাতের কনুই দিয়ে নাক ও মুখ ঢেকে রাখুন।
- বাইরে ব্যবহৃত জুতা ঘরের ভিতরে ব্যবহার করবেন না। খালি পায়ে হাঁটবেন না।
- কারো সঙ্গে হাত মেলানো বা আলিঙ্গন করা থেকে বিরত থাকুন।
- জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্ট অনুভব করলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন এবং অন্যের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকুন।
- হাট বাজার ও যেখানে জন সমাগম বেশী সেখানে যাওয়া যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলুন।
- শিশু, বৃদ্ধ ও যারা দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগছেন তাদের ও ক্রণিক রোগীদের অধিকতর সতর্ক থাকতে বলুন।
- রান্না করার আগে ভালো করে শাক-সবজি, মাছ, মাংস ধুয়ে নিন।
- মাছ-মাংসসহ যেকোনো খাবার ভালোভাবে সিদ্ধ করে রান্না করুন।

নাগরিক উদ্যোগ-ত্রৈমাসিক। বর্ষ: ১০ সংখ্যা: ১ম, অক্টোবর ২০২০-মার্চ ২০২১। রেজি. নং: জেপ্রঢা/প্রকা:/২০১১/৫৫

করোনা প্রতিরোধে সচেতন হই

সঠিক নিয়মে মাস্ক পরুন

কমপক্ষে তিন ফুট শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন

সাবান দিয়ে নিয়মিত হাত পরিষ্কার করুন

জনসমাগম এড়িয়ে চলুন নিজে ভিড় করবেন না

সরকারি নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি